গালিভার্স ট্র্যাভেলস

জোনাথান সুইফট

সংক্ষিপ্ত অনুবাদ

দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং
৬/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

জোনাথান সুইফ্‌ট্ ডি. ডি.

(১৬৬৭— ১৭৪৫

গালিভারের ভ্রমণ-কাহিনী ইংরেজী সাহিত্যের একটি অমর রচনা। ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে বইখানি প্রথম প্রকাশিত হয়। তারপর দুশো চল্লিশ বছর কেটে গেল, কিন্তু আজো এর আকর্ষণ সে-দিনের মতই নতুন।

প্রথম খণ্ড

লিলিপুটের দেশে

এক

ইংলণ্ডের নটিংহাম শায়ারে আমার বাবার কিছু জমি-জায়গা ছিল। সেখানেই আমি মানুষ হয়েছি। আমরা পাঁচ ভাই। আমি সেজ। চৌদ্দ বছরে পা দিতেই বাবা আমাকে কেম্‌ব্রিজে পাঠিয়ে দিলেন। তিন বছর সেখানে কলেজে পড়ি। কিন্তু খরচা তো কম নয়। বাবারও তখন হাত টানাটানি। কাজেই কলেজ ছেড়ে দিতে হলো।

এবার লণ্ডন। মিস্টার জেমস বেট্‌স্ ওখানকার একজন নামকরা ডাক্তার। তিনি আমার বাবার বন্ধু। পুরো চারটি বছর তাঁর কাছে থেকে ডাক্তারী পড়লাম। কিন্তু সেদিকে আমার মন ছিল না। অঙ্ক আর জাহাজ চালানোর বিদ্যা শেখার দিকেই ঝোঁকটা ছিল বেশী। বাবার কাছ থেকে যে সামান্য টাকা পেতাম তা দিয়ে ঐসব বিষয়েরই বই যতটা পারি কিনতাম। কেন জানি না, আমার কেবলই মনে হতো ডাক্তার হওয়া আমার কাজ নয়। জাহাজে জাহাজে সাত সাগরে ঘুরে বেড়ানোই আমার ভাগ্যে লেখা আছে।

কিছুদিন পরই মিস্টার বেট্‌স্-এর আশ্রয় ছেড়ে বাবার কাছে ফিরে এলাম। তাঁর ইচ্ছে, এবার আমি হল্যাণ্ডের লেডেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গিয়ে ভর্তি হই। নগদ চল্লিশ পাউণ্ড হাতে নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বাবা বললেন বছর বছর আরো তিরিশ পাউণ্ড করে আমায় পাঠাবেন।

এখানেও সেই ডাক্তারী। কিন্তু ভালো না লাগলেও এবার আর ফাঁকি দিলাম না। পুরো দুবছর সাত মাস খুব মন দিয়ে পড়াশোনা করলাম। কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলাম, ভবিষ্যতে সমুদ্রে ঘুরে বেড়ানোর সময় এ বিদ্যেটা খুবই কাজে লাগবে।

ভাগ্য ভালো, লেডেন থেকে ফিরে আসা মাত্রই মিস্টার বেট্‌স্‌-এর একখানা চিঠি পেলাম। 'নোয়ালো' নামে একটি জাহাজ শীগগীরই লণ্ডন থেকে ছাড়বে। জাহাজের একজন ডাক্তার চাই। সে চাকরিটি তিনি আমার জন্য ঠিক করে রেখেছেন। এক সপ্তাহের মধ্যেই কাজে যোগ দিতে হবে। হঠাৎ মনের মত এমন চাকরি জুটে যাবে, ভাবতেই পারিনি। সঙ্গে সঙ্গেই আমি লণ্ডন রওনা হলাম।

এক নাগাড়ে সাড়ে তিন বছর এই জাহাজে কাজ করলাম। বার দুই-তিন লেভাণ্ট-এ পাড়ি দিলাম। তারপর এখানে ওখানে আরো কত নতুন জায়গায় যে ঘুরলাম, বলে শেষ করা যায় না। অনেকদিন পর জাহাজ লণ্ডনে ফিরে আসতেই মনটা যেন কেমন হয়ে গেল। ভাবলাম, নাঃ এ ভাবে জলে জলে ভেসে বেড়িয়ে আর লাভ নেই। এখানে বসেই বরং ডাক্তারী করি। শুনে মিস্টার বেট্‌স্‌ও খুব খুশি হলেন। অল্প দিনের মধ্যেই বেশ কিছু রোগী-পত্তরও তিনি জুটিয়ে দিলেন। পসার ভালোই জমে উঠলো। শহরের 'ওল্ড-জিউরি' পাড়ায় ছোটখাটো একটা বাসা নিলাম। কিছু দিনের মধ্যেই মেরি বার্টন নামে একটি মেয়েকে বিয়ে করে নগদ চারশো পাউণ্ড বরপণও হাতে এসে গেল। মেয়ের বাবা ছিলেন নিউগেট স্ট্রীটের এক শাঁসালো দোকানদার।

বছর দুই মন্দ কাটলো না। তারপর হঠাৎ একদিন মিস্টার বেট্‌স্‌ মারা গেলেন। তিনিই ছিলেন আমার মুরুব্বী। ক্রমে রোগীপত্তরও কমে আসতে লাগলো। বাধ্য হয়েই আবার সমুদ্রের দিকে মন ফেরাতে হলো। দুটি জাহাজে পর পর চাকরি করে ছয় ছয়টি বছব কাটলো। ইস্ট ইণ্ডিজ-এর দিকে অনেকবার ঘুরলাম। রোজগারও নেহাত কম হলো না। বাইরে বেরোবার সময় প্রতিবারই আমি অনেক বাছা-বাছা বই সঙ্গে নিয়ে যেতাম। কাজের ফাঁকে বসে বসে সেগুলো পড়তাম আর জাহাজ কোনো বন্দরে ভিড়লেই

তীরে নেমে সেখানকার লোকজনের সঙ্গে মিশে যেতাম। তাদের ভাষা শিখতে চেষ্টা করতাম। রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারও মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করতাম। ভগবানের দয়ায় স্মরণশক্তিটি ছিল ভালো। চেষ্টাও ছিল খুব। তাই কোনো কিছু শিখে নিতে মোটেই দেরী হতো না।

কিন্তু এক ভাবে বেশীদিন থাকা আমার পোষায় না। কিছুদিনের মধ্যেই আবার সেই একঘেয়েমীতে পেয়ে বসলো। এ চাকরি ছেড়ে দিয়ে ডাঙায় বসে ঘর-সংসার করার জন্য মন ছটফট করতে লাগলো। ওল্ড-জিউরির বাসাটা খুব ভালো ছিল না। ওটা ছেড়ে দিয়ে ফেটার-লেন্‌-এ একটা বাড়ী নিলাম। তারপর সেটাও ছেড়ে দিয়ে টেমস্‌ নদীর ধারে 'ওয়াপিং' নামে আর একটা নতুন পাড়ায় উঠে এলাম। এ পাড়ায় জাহাজী নাবিকদের আনাগোনা ছিল বেশী। ভেবেছিলাম এদের মধ্যে পসার জমবে ভালো। কিন্তু এবারও বরাত মন্দ। ঘরের খেয়ে আর কতদিন বনের মোষ তাড়ানো যায়! শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে আবার সেই চাকরির খোঁজেই নামতে হলো। যোগাযোগের ভাগ্যটি আমার বরাবরই ভালো। এবারও 'এ্যান্টিলোপ' নামে একটি জাহাজ দক্ষিণ সাগর পাড়ি দেবার জন্য তৈরী হচ্ছিল। সেখানেই একটা দরখাস্ত ঠুকে দিলাম।

আবার সেই ডাক্তারের চাকরি।

১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে বৃস্টল বন্দর থেকে জাহাজে উঠলাম।

প্রথম কয়েক মাস ভালই কাটলো। তারপর হঠাৎ একদিন সাংঘাতিক ঝড়ের মুখে পড়ে পথ হারিয়ে ফেললাম। যখন বুঝতে পারলাম যে 'ভ্যান্‌-ডিমাম'-এর উত্তর উপকূল দিয়ে আমরা ভেসে চলেছি, তখন খালাসীদের মধ্যে বারো আনাই রোগে আর হাড়-ভাঙা খাটনীতে খতম। বাদ বাকী যারা পড়ে আছে তারাও অকেজো আর আধমরা। কিন্তু সর্বনাশের তখনো বাকি ছিল।

সেদিন নভেম্বর মাসের পাঁচ তারিখ। সমুদ্রের যেখানটা দিয়ে

আমরা যাচ্ছিলাম, এরই মধ্যে সেখানে গরমের আবহাওয়া শুরু হয়েছে। বাতাস ভারী, চার ধার কুয়াশায় থমথমে। ভালো করে কিছু দেখা যায় না। অসহ্য গুমোটে নিঃশ্বাস নিতেও যেন কষ্ট হচ্ছিল। মনমরা হয়ে চুপচাপ বসে ছিলাম, হঠাৎ কয়েকটি খালাসীর বিকট চীৎকারে চমকে উঠলাম। "পাহাড়! পাহাড়! একেবারে জাহাজের নাকের ডগায়—সামাল! হুঁসিয়ার! ধাক্কা মারলো বলে—"

কাপ্তেন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। প্রাণপণে চেষ্টা করলেন পাশ কাটাতে, কিন্তু পারলেন না। দেখতে দেখতে জাহাজ গিয়ে সেই পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়লো আর সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙে চূরে তলিয়ে যেতে লাগলো।

চোখের পলকে ছয়জন খালাসীর সাহায্যে একটি লাইফ-বোট (জীবন-তরী) আমি জলের উপর নামিয়ে ফেললাম। তারপর প্রাণটি মাত্র হাতে নিয়ে তার মধ্যে লাফিয়ে পড়লাম। একদিকে ডুবন্ত জাহাজ আর একদিকে দৈত্যের মত খাড়া পাহাড়। কি ভাবে যে তাদের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এলাম যীশুখ্রীষ্টই জানেন। কিন্তু আর পারছিলাম না। খোলা সমুদ্রে কয়েক মাইল দাঁড় টানতে টানতে হাতে পায়ে খিল ধরে এসেছিল। এক সময় যা থাকে কপালে বলে, হাল ছেড়ে দিয়ে নায়ের ভেতর নেতিয়ে পড়া ছাড়া আর উপায় রইলো না।

কিন্তু তাই বা কতক্ষণ? হঠাৎ কোথা থেকে উত্তুরে বাতাসের একটা দমকা রাক্ষসের মত ছুটে এসে নৌকাখানাকে একেবারে উল্টে দিল। সবাই জলের উপর ছিটকে পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগলাম। সাথীরা কে কোথায় তলিয়ে গেল কে জানে! কুটোর মত আমি একা একা স্রোতের মুখে ভেসে চললাম। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে এই বুঝি শেষ, কিন্তু রাখে হরি মারে কে? বাতাস ও জোয়ারের টান আমাকে বোধ হয় তীরের দিকেই নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ এক

সময় পায়ের তলায় মাটির ছোঁয়া লাগলো। তীর তখনো প্রায় এক মাইল দূরে। মরিয়া হয়ে জল ঠেলে সেদিকে এগিয়ে চললাম। ডাঙায় গিয়ে যখন উঠলাম তখন রাত প্রায় আটটা।

ধারে কাছে কোনো জনপ্রাণী বা বাড়ীঘরের চিহ্ন নেই। এগিয়ে গিয়ে যে খুঁজে দেখবো সে শক্তিও শেষ। খিদেয়, তেষ্টায় আর পরিশ্রমে শরীর তখন থরথর করে কাঁপছে। ধুঁকতে ধুঁকতে সেখানেই লুটিয়ে পড়লাম। তারপর আর কিছু মনে নেই।

দুই

ঘুম ভাঙলো প্রায় সাড়ে ন'ঘণ্টা পরে। আমি চীৎ হয়ে পড়ে আছি। দিনের আলোয় চারদিক ধবধব করছে। উঠে বসতে যাবো, কিন্তু একি? আমার গা হাত-পা সব কিছুই খুঁটোর সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা। এমন কি মাথার লম্বা লম্বা চুলগুলোও। খোলার মধ্যে কেবল চোখ দুটি। কিন্তু রোদের তেজ বেড়ে উঠতে সে দুটিও বন্ধ করতে হলো।

চারধারে অনেক লোকের আনাগোনা ও গোলমালের শব্দ। কিন্তু যেভাবে বাঁধা রয়েছি, আকাশ ছাড়া কিছু দেখবার উপায় নেই। উশখুশ করছি, হঠাৎ মনে হলো, জ্যান্ত কিছু একটা জিনিস সুড়সুড় করে আমার বাঁ পায়ের উপর দিয়ে হাঁটছে। একটু পরেই সেটা বুকের উপর উঠলো। তারপর সেখান থেকে একেবারে চিবুকের গোড়ায়। চোখের চাউনি যতটা পারি নামিয়ে জিনিসটার দিকে ফেললাম, আর সঙ্গে সঙ্গেই থ' হয়ে গেলাম। মানুষ? হ্যাঁ মানুষই তো বটে! কিন্তু এমন মানুষ তো কখনো দেখিনি! লম্বায় খুব বেশী তো ছয় ইঞ্চি। এক হাতে একটি ক্ষুদে ধনুক, আর এক হাতে তার চেয়েও পুঁচকে একটা তীর, পিঠে তূণ, কুতকুত করে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। তারপর দেখি ও একাই নয়, ওর মত আরো প্রায় চল্লিশটি জীব পেছন পেছন এসে সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে।

কাণ্ড দেখে প্রথমটা যেন মাথার মধ্যে সব তালগোল পাকিয়ে গেল। কি করবো, না করবো কিছুই ভেবে পেলাম না। তারপরই হঠাৎ গলা ফাটিয়ে এ্যায়সা জোরে খেঁকিয়ে উঠলাম যে সঙ্গে সঙ্গেই ওরা নেংটি ইঁদুরের মত ছুটতে গিয়ে, এলোপাথাড়ি এ ওর গায়ে পড়ে লুটোপুটি খেতে লাগলো। কেউ কেউ ঝুপঝাপ আমার গায়ের

উপর থেকে লাফ দিতে গিয়ে হাত-পাও ভাঙলো। ভাবলাম আপদ গেছে! কিন্তু একটু পরেই আবার ওরা গুটি-গুটি আমার গায়ের উপর এসে উঠলো। একজন তো সাহস করে মুখের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাকে দেখলো, তারপর দু'হাত উপরে তুলে, চোখ নাচিয়ে, হেঁড়ে গেলায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কি যেন বলতে লাগলো। ওর দেখাদেখি আরগুলোও কয়েকবার ও-রকম করলো। কিন্তু কি যে বলছে, আমি তার বিন্দু-বিসর্গও বুঝতে পারলাম না।

এদিকে এক নাগাড়ে চীৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে পিঠ আমার টাটিয়ে উঠেছে। বোঁ করে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বাঁ হাতখানাকে একটু আল্‌গা করে নিলাম। দড়িগুলো দেখতে সুতোর মত হলে কি হবে! বেজায় শক্ত। পট পট করে তার অনেকগুলো তো ছিঁড়লোই, কাঠের খুঁটোও কয়েকটা উপ্‌ড়ে উঠে এলো। এরপর আর এক ঝাঁকুনি, মাথা দিয়ে। ব্যথা একচোট পেলাম বটে, কিন্তু কাজ হলো। বাঁ দিককার যে চুলগুলো টান-টান করে বাঁধা ছিল দড়ি-দড়া ছিঁড়ে সেগুলো প্রায় আলগা হয়ে গেল। আঃ! এবার অন্তত ইঞ্চি দুই মুণ্ডুটিকে ঘোরাতে ফেরাতে পারবো।

হ্যাঁচকা টানের বহর দেখেই ক্ষুদেগুলো আর একবার এমন জোরে পিঠটান দিল যে ধরি ধরি করেও এক আধটাকেও বাগে পেলাম না। ছুট দিয়েই দূরে দাঁড়িয়ে ওদের মধ্যে একজন বাজখাঁই গলায়, হুকুমের ঢঙে কি যেন বললো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সূঁচের মত এক ঝাঁক তীর আমার গালে ও পাঁজরে এসে বিঁধলো। মুখখানাকে বাঁচানোর জন্য বাঁ হাত দিয়ে তাকে ঢেকে ফেললাম। বাঁধন ছেঁড়ার জন্য জোরসে আর একবার চেষ্টা করলাম। এবারও আর এক ঝাঁক তীর ছুটে এলো। কেউ কেউ আবার হাতের বর্শা দিয়ে আমার পাঁজরেও খোঁচা দিতে লাগলো। ভাগ্যিস গায়ে পুরু চামড়ার কোট ছিল, তাই বেঁচে গেলাম। ভেবে দেখলাম, এতে সুবিধে হবে না। রাত না হওয়া পর্যন্ত মটকা মেরে পড়ে থাকাই ভালো। একখানা

হাত তো খোলা আছে। সেখানা দিয়ে নিজেকে খালাস করে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে হয়তো পালানো যাবে। দড়ি-দড়া ছিঁড়ে একবার খাড়া হয়ে উঠতে পারলে আর আমাকে পায় কে !

কিন্তু কপালের লেখা ছিল অন্য রকম। ভালো মানুষের মত পড়ে থাকতে দেখে ওরা আমাকে আর ঘাঁটালো না বটে, কিন্তু আমার চার গজের মধ্যে কি একটা কাণ্ড কারখানা যেন শুরু করে দিল। ঠক-ঠক-ঠক-ঠক···ঘণ্টাখানেক ধরে, একটানা একটা আওয়াজ চললো। মাথাটি হেলিয়ে আড়চোখে দেখলাম জমি থেকে এক-দেড় ফুট উঁচু একটি কাঠের মঞ্চ তৈরী হয়েছে। ওদের চার-পাঁচটি মানুষ তার উপর একসঙ্গে দাঁড়াতে পারে। ভিড়ের মধ্য থেকে কেউ-কেটা গোছের একজন সেই মঞ্চের উপর উঠলেন। হাত নেড়ে নেড়ে বক্তৃতার মত কি যে বললেন কিছুই বুঝতে পারলাম না। লোকটি মাঝবয়েসী। একটু লম্বা ধরনের চেহারা। মনে হলো কথাগুলো তিনি আমাকেই বলছেন। কখনো যেন হুমকি দিচ্ছেন, কখনো নরম ভাব দেখাচ্ছেন। কথা শেষ হলে, চোখের উপর হাত চাপা দিয়ে ওকে বোঝালাম যে আমার মুখে রোদ পড়ছে। হাঁ করে মুখের মধ্যে আঙুল দিয়ে বোঝালাম যে আমার খিদে আর তেষ্টাও পেয়েছে। মনে হলো লোকটি ভদ্র। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মঞ্চ থেকে নেমে এলেন এবং লোকগুলোকে কি যেন হুকুম করলেন। একটু পরেই আমার গায়ের পাশে ঠেস দিয়ে কয়েকটি মই খাড়া করে দেওয়া হলো। তারপর প্রায় একশো লোক ঝুড়ি ভরতি মাংস মাথায় নিয়ে মই বেয়ে আমার গায়ের উপর উঠে এলো। পরে শুনেছিলাম, মহারাজ নাকি আমার জন্য এ সব খাবার আগেই রাঁধিয়ে রেখেছিলেন। মাংসের মধ্যে নানা রকম প্রাণীর ঘাড়, পা ও কোমরের টুকরো মেশানো ছিল। মনে হচ্ছিল বুঝি ভেড়ার মাংস, কিন্তু ঠিক সে রকমও যেন নয়। রান্না খুব ভালো হয়েছিল, কিন্তু টুকরোগুলো এত ছোট যে মুখে তোলাই দায়। আমি একসঙ্গে

অনেকগুলো করে মুখে পুরতে লাগলাম। পাউরুটির চেহারাও তেমনি। আমাদের দেশের মটরদানার মত। এক এক বারে তিন চারখানা মুখে না ফেললে শানায় না।

যা হোক খুব চটপট আমি খেয়ে নিলাম। খাওয়ার বহর দেখে তো ওদের চক্ষু চড়কগাছ। বাপ্‌রে বাপ্‌, একটা লোক এত খেতেও পারে? এবার জল খাবার পালা। লোকগুলো বেশ চালাক-চতুর। ইশারা করা মাত্র জনকয়েক মিলে একটা পিপে গড়িয়ে এনে ঢাকনা খুলে আমার হাতের গোড়ায় রাখলো। এক চুমুকেই সেটা শেষ করে আর একটার জন্য হাত বাড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গেই সেটাও এসে হাজির। এক একটা পিপেয় কতটুকু আর জল ছিল? খুব বেশী তো আধ পাঁইট। কিন্তু জিনিসটা ঠিক জল নয়। অনেকটা মদের মত। খুব সুন্দর খেতে। আর একটু খাওয়ার ইচ্ছে ছিল কিন্তু হলো না। পিপে মোটে ঐ দুটিই ছিল।

খাওয়ার পাট চুকতেই মহা ফুর্তিতে লোকগুলো ধেই ধেই করে আমার গায়ের উপর নাচগান শুরু করে দিল। কেউ কেউ খালি পিপে দুটো নীচে ফেলে দিতেও আমাকে ইশারা করলো। আমিও রাজী হয়ে গেলাম। চেঁচিয়ে নীচের লোকজনকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হলো যেন গড়ানো পিপের তলায় কেউ চাপা না পড়ে। বার কয়েক পাক দিয়ে, লাট্টুর মত আমি পিপে দুটোকে শূন্যে ছুঁড়ে দিলাম। লাফিয়ে ঝাপিয়ে পাগলের মত ওরা আর একবার একসঙ্গে চীৎকার করে উঠলো।

এক একবার ইচ্ছে হচ্ছিল পুঁচকেগুলোকে একটু শিক্ষা দিয়ে দিই। একেবারে চল্লিশ-পঞ্চাশটাকে খপ্‌ করে হাতের থাবায় তুলে নিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলি। কিন্তু তীরের খোঁচা খাবার ভয়, তাছাড়া এইমাত্র অমন আদরযত্ন করে খাওয়ানোর কথা মনে করে সে ইচ্ছা চেপে গেলাম। কিন্তু আশ্চর্য ওদের দুঃসাহস! ওদের তুলনায় আমি তো একটা দৈত্য বিশেষ! তার উপর হাতও আমার একখানা

খোলা। তবু আমার গায়ে চড়ে এমন দাপাদাপি করতে ওদের ভয় নেই ?

কিছুক্ষণ এইভাবেই কাটলো। তারপর ওরা যখন বুঝতে পারলো যে আমার আর কিছু চাইবার নেই, তখন ওদের মাতামাতি বন্ধ হলো। এবার মহারাজের তরফ থেকে আর একজন হোমরা-চোমরা লোক দশ-বারো জন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে আমার হাঁটুর উপর দিয়ে হেঁটে একেবারে মুখের গোড়ায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁর হাতে মহারাজের একটি হুকুম-নামা। খুব আদব-কায়দার সঙ্গে তিনি সেটি খুললেন। তারপর আমার চোখের সামনে ধরে জোর গলায় পড়তে লাগলেন।

পড়া শেষ হতে প্রায় দশ মিনিট লাগলো। সে সময় ঘন ঘনই ডান হাত তুলে সামনের দিকে কি যেন তিনি দেখাচ্ছিলেন। পরে জানতে পেরেছিলাম যে ঐ দিকেই রাজ্যের রাজধানী এবং আমাকে সেখানে নিয়ে যাবার জন্য মহারাজ ওঁকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি চুপ করলে আমিও দুচার কথা বললাম, কিন্তু কেউ তা বুঝতে পেরেছে বলে মনে হলো না। তবু হাল ছেড়ে না দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে হাত-মুখ নেড়ে আমি বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে এভাবে আটকে না রেখে এখন আমাকে ছেড়ে দিলেই আমি সব চেয়ে খুশি হই। হয়তো ভদ্রলোক আমার মনের কথা ধরতে পারলেন। কিন্তু মাথা নেড়ে জানালেন, তা হতে পারে না। কেননা তিনি হুকুমের চাকর। সেই সঙ্গে এও জানালেন যে, ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমাকে কোনো রকম কষ্ট দেওয়া হবে না। খাবার-দাবার, মদ যখন যা চাই আমি পাবো, এবং আমার সঙ্গে খুবই ভালো ব্যবহার করা হবে।

রাগে দুঃখে আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠলো। জোরালো হ্যাঁচকা টানে আর একবার তেড়িয়া হয়ে উঠলাম, কিন্তু লাভ বিশেষ কিছু হলো না। আরো কিছু তীরের খোঁচা খাওয়াই সার হলো। ব্যথা-বেদনায় গা ঝিমঝিম করে উঠলো। টুঁ শব্দটি না করে

আবার চুপচাপ হয়ে পড়ে রইলাম। করো তোমরা যা খুশি আমাকে নিয়ে।

এদিকে পিল পিল করে কখন যে এক গাদা লোক আমার বাঁয়ে এসে জড়ো হয়েছে বুঝতেই পারিনি। হঠাৎ মনে হলো আমার বাঁধন-দড়িগুলো যেন আস্তে আস্তে আলগা করে দেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ সত্যি তাই। খানিক পরেই কষ্টের কিছু লাঘব হলো। অনায়াসে ডান দিকে পাশ ফিরতে পারলাম। মুখে হাতে তখনো তীরগুলো বিঁধে ছিল। পট পট করে ওরা সেগুলোও তুলে ফেললো। তারপর সেখানে বেশ সুগন্ধি একটা মলম মাখিয়ে দিল। খানিক আগেই খাওয়াটি হয়েছে ভরপেট। এখন ব্যথা-বেদনাও আর রইলো না। আরামে আমার ছু চোখ ঘুমের নেশায় জড়িয়ে এলো। পরে শুনেছিলাম, মহারাজের কথামত আমার মদের সঙ্গে নাকি বেশ খানিকটা ঘুম-পাড়ানী ওষুধ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। একটানা প্রায় আট ঘণ্টা আমি ঘুমিয়ে রইলাম।

এর মধ্যে হয়েছে কি, আমি ঘুমিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজের কানে সে খবর গিয়ে পৌঁছেছে। মন্ত্রীদের সঙ্গে কথা-বার্তা কয়ে তিনি তখনি ঠিক করে ফেললেন যে ঐ অবস্থায়ই বেঁধে-ছেদে আমাকে রাজধানীতে নিয়ে যাওয়া হবে।

সঙ্গে সঙ্গেই কাজ শুরু হয়ে গেল। মানুষগুলো পোকার মত হলে কি হবে। বেশ বুদ্ধিমান। অঙ্কে পাকা, যন্ত্রপাতি তৈরী করতেও বেশ ওস্তাদ। বন থেকে বড় বড় গাছ কেটে, তাই দিয়ে ওরা জাহাজ বানাতো। সে জাহাজ সমুদ্রে টেনে নিয়ে যাবার মত ভারী ভারী চাকা লাগানো এক রকম গাড়ীও ওদের তৈরী ছিল। এখন পাঁচশো মিস্ত্রী এক সঙ্গে কাজে লেগে গেল। ওরকমই কিছু একটা বানানো চাই। তবে আগের চেয়ে অনেক বড় আর অনেক বেশী

চট করে সাত ফুট লম্বা আর চার ফুট চওড়া একটা মাপসই

কাঠের পাটাতন তৈরী হয়ে গেল। তলায় বাইশটি চাকা লাগানোর পর জমি থেকে সেটি তিন ইঞ্চির মত উঁচুতে রইলো। তারপর আল-গোছে সেটিকে আমার ঘুমন্ত শরীরের পাশে নিয়ে আসা হলো। এবার আমাকে ঐ পাটাতনের উপর তুলতে পারলেই হয়।

খুব বেশী মাথা ঘামানোর দরকার হলো না। আমার চার ধারে আশিটি মোটা মোটা থাম পোতা হলো। তাদের মাথায় লাগানো হলো কপিকল। দড়ি পরিয়ে সেগুলো নেড়ে চেড়ে পরীক্ষা করা হলো। দেখতে সরু-সরু হলেও দড়িগুলো বেজায় শক্ত। প্রত্যেকটি দড়ির মাথায় বড়শীর মত পাকা-পোক্ত হুক্ ঝোলানো হলো। গলা থেকে পা পর্যন্ত আমার গোটা শরীরটাকে মজবুত ফিতে দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বেঁধে ফেলা হলো। তারপর কপিকলের হুক্ বা আংটাগুলো সেই ফিতের সঙ্গে লটকিয়ে নয়শো শাবাশ জোয়ান হেঁইও-হেঁইও করে প্রায় তিন ঘণ্টার চেষ্টায় আমাকে তক্তার উপর টেনে তুললো।

সেখানেও আর এক দফা বাঁধা-ছাদার পর পনেরশো বাছাই ঘোড়া সেই গাড়ীতে জুতে দেওয়া হলো। ঘোড়াগুলো দেখবার মত। এক একটা মাথায় সাড়ে চার ইঞ্চি উঁচু আর তেমনি তাগড়াই।

এত কাণ্ড যে ঘটে গেল আমি কিন্তু কিছু টেরই পেলাম না। তখনো আমি অঘোরে ঘুমুচ্ছি।

রওনা হবার প্রায় ঘণ্টা চারেক পরে মাঝ পথে হঠাৎ আমি জেগে উঠলাম। গাড়ীটার বোধ হয় কল বিগড়ে গিয়েছিল। মেরামতির জন্য থামানো হয়েছিল। সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত। এমন সময় দু তিনটে লোক চুপি চুপি কখন যে আমার বুকের উপরে এসে উঠেছে, কেউ টেরই পায়নি। ঘুমুলে আমার চেহারাখানা কেমন দেখায় সেটা পরখ করাই বোধ হয় ওদের ইচ্ছে ছিল। ওদের মধ্যে যেটা পালের গোদা, সে ছিল আমার পাহারাওলাদের সর্দার। মজা দেখবার জন্য সে ব্যাটা তার বর্শার ডগাটি আমার

নাকের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়। ঘুমের মধ্যে আমার মনে হচ্ছিল কে যেন খড় দিয়ে নাকের ভেতরটা চুলকাচ্ছে। সেই শুড়শুড়িতেই আমি জেগে যাই। আর হ্যাঁচ্চো করে বিকট শব্দে হেঁচে উঠি। লোকগুলোও সঙ্গে সঙ্গেই পড়ি-কি-মরি করে চোঁচা দৌড়। আমি ভেবেছিলাম হাঁচিতেই বুঝি ঘুমটা ভেঙেছে। কিন্তু আসল কারণটা জানতে পেরেছিলাম প্রায় তিন সপ্তাহ বাদে।

যা হোক, গাড়ী সারানো হলেই আবার চলতে শুরু করলো। বেলা একেবারে পড়ে এসেছিল। কিছু দূর গিয়েই রাতের মত বিশ্রাম নিতে হলো। আড়াইশো মশালচি আর আড়াইশো তীরন্দাজ মোট পাঁচশো পাহারাদার আমার এক এক দিকে মোতায়েন হলো। নড়াচড়া বা বেয়াড়াপনা করলেই ওরা আমার গায়ে তীর মারবে। পরদিন ভোরবেলা রওনা হয়ে দুপুরের আগেই গাড়ী শহরের বড় ফটকের সামনে এসে দাঁড়ালো।

মহারাজ তাঁর দলবল নিয়ে আগে থাকতেই সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। গাড়ী থামতেই তিনি এগিয়ে এলেন। আমাকে বোধ হয় তিনি এই প্রথম দেখলেন। তাড়াতাড়ি তিনি আমার গায়ের উপর উঠতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সবাই নিষেধ করলো। কি জানি হঠাৎ কোন্ বিপদ ঘটে কে জানে!

কাছেই, পথের এক পাশে মস্ত একটা পুরোনো মন্দির। ওদেশের মধ্যে ওটাই নাকি সবচেয়ে বড়। অনেকদিন আগে ওখানে একটা খুন হয়। সেই থেকেই ভেতরের ঠাকুর দেবতা, বাসন-কোসন ও জিনিসপত্র সব সরিয়ে ফেলে, অপবিত্র মনে করে ওটাকে পড়ো বাড়ীর মত ফেলে রাখা হয়েছিল। এখন ওখানেই আমার থাকার জায়গা হলো।

মন্দিরের উত্তরমুখো দরজাটা ওদের ধারণায় বিরাট। প্রায় চার ফুট উঁচু আর দু ফুট চওড়া। আমার পক্ষে ওর ভেতর দিয়ে কোন রকমে গলে যাওয়া চলে। দরজার দুপাশে দুটি জানালা। মাটি

থেকে তারা প্রায় ছ ইঞ্চি-উঁচুতে। প্রত্যেকটির শিকের সঙ্গে একা-নব্বইটি করে লোহার শেকল ঝুলছিল। দুদিক থেকে তাদের আংটাগুলো টেনে এনে আমার দু পায়ে পরিয়ে দেওয়ার পর এক এক পায়ে ছত্রিশটা করে তালা এঁটে দেওয়া হলো।

মন্দিরের মুখোমুখি বড় রাস্তার গায়ে পাঁচ ফুট উঁচু একটি মীনার। এবার ভালো করে আমার মূর্তিটি দেখার জন্য মহারাজ বাহাদুর পাত্র-মিত্র নিয়ে একেবারে তার উপরে গিয়ে উঠলেন। আমার খবর পেয়ে আশপাশ থেকেও লাখে লাখে মানুষ পঙ্গপালের মত ছুটে এসেছিল। চারদিক লোকে লোকারণ্য। আমাকে ঘিরে কড়া পাহারা। কিন্তু কে কার তোয়াক্কা রাখে? এত লোকের ধকল সামলাতে চৌকিদাররা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল। তাদের পিটুনি, গলাধাক্কা ও গালাগালির ফাঁক দিয়েও প্রায় হাজার দশেক মানুষ আমার গায়ের উপর ঠেলে উঠলো। আমার তো প্রাণ যায়। দেখে শুনে মহারাজের বোধ হয় দয়া হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি হুকুম দিয়ে দিলেন যে এভাবে যে কেউ আমার গায়ের উপর চড়ে বসবে তাকে তিনি মৃত্যুদণ্ড দেবেন।

হুকুমে কাজ হলো। কিন্তু খুশি হতে পারলাম কই? পায়ের বেড়ী তো এখনো ঘুচলো না। শেকলগুলো লম্বায় দু'ফুটের মত ছিল বলে ঘরের মেঝেতে যা-হোক কিছুটা পায়চারী করা যেতো। অনেক দিন এক নাগাড়ে শুয়ে থাকার পর ওঠা-বসার আয়েসটুকুও মন্দ লাগতো না। ইচ্ছে হলে মাথা নামিয়ে দরজা দিয়ে বাইরেটাও দেখতে পেতাম, আর শোয়াটিও হতো মোটামুটি হাত-পা ছড়িয়ে লম্বা হয়ে। কিন্তু মনের দুঃখ একতিলও হাল্কা হলো না। যে কয়েদী সেই কয়েদীই রইলাম। এমন ব্যথা জীবনে আর কখনো বোধ করিনি।

তিন

খোলা দরজা দিয়ে এভাবে এই প্রথম বাইরের দিকে চাইলাম, ছ'চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। দেশটা এত সুন্দর? ঠিক যেন একখানা সাজানো বাগানের মত। এমন অবাক ছবি আর কখনো চোখে পড়েনি। সামনেই খোলা মাঠ। লম্বা চওড়ায় দেড়শো বর্গ ফুটের কম নয়। যেমন সবুজ, তেমনি কোমল। তার উপর কত রঙের যে ফুল ফুটে আছে! অবিকল একখানা রঙীন গালিচা যেন মাটির উপর বিছানো।

মাঠের ওপারে বন। তার রঙ আরো ঘন সবুজ। সেখানকার সব চেয়ে উঁচু গাছগুলোও আশ্চর্য। মাথায় তারা আমার চেয়ে খুব বেশী তো এক ফুটের মত লম্বা। বাঁয়ে, খানিকটা দূরে শহর। ঠিক সত্যিকারের যেন নয়। থিয়েটারের পর্দায় আঁকা ছবির শহরের মত দেখতে।

আমি যখন অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে ছিলাম, মহারাজ মঞ্চ থেকে নেমে ঘোড়ায় চড়ে আমার দিকে আসছিলেন। কাজটা তিনি খুব ভালো করেননি। কারণ ঘোড়াটি তাঁর খুব শিক্ষিত ও পোষমানা হলেও আমার কাছাকাছি আসা মাত্রই ভয়ে পেছনের ছুপায়ের উপর খাড়া হয়ে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে উঠলো যে মহারাজ প্রায় পড়েই যাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনিও পাকা ঘোড়সোয়ার। চোখের পলকে টাল সামলে নিলেন। লোকজনও দৌড়ে এলো। লাগাম ধরে ঘোড়াটাকে বাগে আনতেই রেকাবে পা দিয়ে তিনি নীচে নামলেন। কিন্তু খুব কাছে এলেন না। আমার শেকলের পাল্লার বাইরে দিয়ে কয়েকবার ঘুর ঘুর করলেন। তারপর বাবুর্চি ও খানসামাদের ডেকে আমায় খাবার দিতে বললেন।

চাকা-লাগানো ছোট ছোট কুড়িখানা ঠেলাগাড়ী আমার দিকে এগিয়ে এলো। তাদের দশখানায় ছিল খাবার আর বাকি দশখানায় পানীয়। গাড়ী দেখতেই এতগুলো। এক একখানায় আমার ছু'তিন গরাসের বেশী খাবার বা তু'এক চুমুকের বেশী জল ছিল না। দেখতে দেখতে আমি সেগুলোকে খালি করে ফেললাম।

মহারাজ একাই নন, তাঁর সঙ্গে মহারানী ও তাঁর ছেলেমেয়েরাও এসেছিলেন। লোকজন নিয়ে একটু দূরে তাঁরা চেয়ারের উপর বসে ছিলেন। মহারাজ ঘোড়া থেকে নামলে তাঁরাও এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন।

মহারাজের চেহারাটি স্থন্দর। শরীরটিও বেশ বলবান। আশে-পাশে যত লোক ছিল তাদের চেয়ে মাথায়ও কিছু লম্বা। বয়স আটাশ বছর। আমাদের হিসেবে যুবক হলেও ওদেশের হিসেবে আধবুড়ো। সাত বছর হলো তিনি সিংহাসনে বসেছেন। প্রজারাও বেশ স্থখে শান্তিতেই আছে। আমার থেকে প্রায় তিন গজ দূরে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। চেহারাটি ভালো করে খুঁটিয়ে দেখার জন্য আমি মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম। পরে অবশ্য অনেকবারই তাঁকে হাতের উপর তুলে আরো ভালো করে দেখার স্থযোগ পেয়েছি।

পোশাক-আশাকে তিনি অনেকটা সাধাসিধে। তবে সেগুলোর ধরন-ধারণ একটু অদ্ভুত। যেন ইউরোপ আর এশিয়ার মেশানো ঢঙে তৈরী। মাথায় মণিমুক্তো-বসানো সোনার মুকুট। সামনে স্থন্দর পালকের চূড়া। হাতে খাপ-খোলা তরোয়াল। ফলাটি লম্বায় তিন ইঞ্চির মত। হঠাৎ যদি আমি শেকল ছিঁড়ে তাঁর উপর লাফিয়ে পড়ি, বোধহয় এই ভয়েই তিনি সেটি হাতে করেই ছিলেন। খাপটি কোমরে ঝুলছিল। তরোয়ালের বাঁটের মত সেটিও ছিল সোনার এবং দামী দামী হীরে বসানো।

কিছুটা খন্‌খনে হলেও মহারাজের গলার আওয়াজটি বেশ

ভরাট। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও আমি তার প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট শুনতে পেতাম। মহারানী, তাঁর ছেলে মেয়ে ও আর সকলের পোশাকও দেখবার মত। উপর থেকে তাদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন সোনা-রূপার কাজ করা, নানা রঙের একফালি ঝলমলে চাদর মাটির উপরকে ছড়িয়ে রেখেছে।

মহারাজ আমার সঙ্গে আলাপ করতে চেষ্টা করলেন। আমিও জবাব দিলাম। কিন্তু কেউ কাউকে বুঝতে পারলাম না। তাঁর পুরোহিত ও উকিলদের মধ্যে যাঁরা সেখানে হাজির ছিলেন তাঁরাও কয়েকবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ডাচ, ফরাসী, ল্যাটিন, ইটালীয়ান ও স্পেনিশ,—যতগুলো ভাষা আমার জানা ছিল তাদের কোনোটি দিয়েই তাদের কিছু বোঝানো গেল না।

যা হোক, ঘণ্টা দুই পর মহারাজ বিদায় নিলেন। যাবার আগে আর একবার আমার চারদিকে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করে গেলেন যাতে লোকজন যখন তখন আমার উপর চড়াও হয়ে যা খুশি তাই করতে না পারে। কিন্তু তাতেও যে আমি রেহাই পেলাম তা নয়। লুকিয়ে চুরিয়ে কেউ কেউ আমার দিকে এমন ভাবে তীর ছুঁড়লো যে অল্পের জন্য চোখ দুটি বেঁচে গেল। ব্যাপারটা অবশ্য সর্দারের নজর এড়ালো না। সঙ্গে সঙ্গেই দু'জন আসামীকে গ্রেপ্তার করে, হাত বেঁধে, বর্শার মুখে ঠেলতে ঠেলতে সে আমার কাছে নিয়ে এলো।

ইচ্ছে করলে আমি ওদের মেরে ফেলতে পারতাম। অন্তত মুখের ভাবখানা সে-রকম করে বদমাশগুলোকে খপ্‌ করে তুলে নিয়ে, পাঁচটাকে তো সঙ্গে সঙ্গেই পকেটের ভেতর পুরে ফেললাম। আর একটাকে মুখের কাছে ধরে এমন ভাব দেখালাম যেন এক্ষুণি ওকে কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবো। হাউ-মাউ করে লোকটার কি কান্না! এর উপর যখন আবার কোমর থেকে চকচকে ছুরিটা বের করে আনলাম, পাহারাওলারা পর্যন্ত ভয়ে ঠক-ঠক করে কাঁপতে লাগলো। ওরা ভাবলো এবার আর শয়তানটাকে কেটে টুকরো

টুকরো না করে আমি ছাড়বো না। কিন্তু সে সব কিছুই না করে যখন চাকু দিয়ে আমি ওর হাতের দড়ি কেটে দিলাম, আর বাদ-বাকিগুলোকেও এক এক করে পকেট থেকে বের করে দড়ি কেটে আলগোছে মাটির উপর নামিয়ে দিয়ে বললাম, 'যাঃ—পালা'—তখন সবাই শুধু হাঁফ ছেড়েই বাঁচলো না, আমার উপর এত খুশি হলো যে আমার এই ভালোমানুষীর কথা দশখানা করে মহারাজের কানে তুলতেও দেরী করলো না।

রাত্রে মন্দিরের খালি মেঝেতেই শুতাম। দিন পনেরোর মধ্যে এ কষ্টেরও লাঘব হলো। ওদেশের লোকের শোবার মত প্রায় ছয়শো খানা তক্তপোষ এক সঙ্গে জোড়া দিয়ে আমার জন্য একখানা খাট তৈরী হলো।

আমার কথা দেশের অনেক দূর অবধি ছড়িয়ে পড়েছিল। রোজই পালে পালে মানুষ আমাকে দেখতে আসতো। দেশ গাঁ প্রায় খালি হয়ে যাবার যোগাড়! চাষ-বাস ও অনেক কাজ-কারবারই শিকেয় উঠলো। মহারাজ ও তাঁর আমলারা মহা ভাবনায় পড়লেন। দেশের লোকের উপর হুকুম হলো, যারা দেখেছো, পত্র পাঠ যে যার ঘরে ফিরে যাও। আর যারা এখনো দেখোনি, তারা মাথাপিছু রাজসরকারে একটা দর্শনী জমা দাও, তা না হলে মন্দিরের ধারে কাছেও আসতে দেওয়া হবে না। সেই থেকে ভিড় কমতে লাগলো। আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

এদিকে যতই দিন যাচ্ছিল, রাজদরবারে আমাকে নিয়ে মাথা-ব্যথার অন্ত ছিল না। তাঁরা ভয় করছিলেন যে কোন সময় শেকল ছিঁড়ে বেরিয়ে আমি দেশটাকে তচনচ করে ফেলবো। তাছাড়া এমন একখানা পেটকে বসিয়ে বসিয়ে রোজ দু-বেলা ভরা, সেও তো চাট্টিখানি কথা নয়! দু'দিনেই দেশ ফতুর হয়ে যাবে—চারদিকে আকাল শুরু হয়ে যাবে।

মাঝখানে তাঁরা এও ভেবেছিলেন যে বিষ-মাখানো তীরে বা না

খেতে দিয়ে আমাকে শেষ করে দেওয়া হোক। কিন্তু তারপর? এত বড় একখানা লাশ নিয়ে তাঁরা সামলাবেন কি করে? পচে গলে গন্ধ ছড়িয়ে দেশময় মড়ক ডেকে আনলে, তখন? সেই ভয়েই ওদের পিছিয়ে পড়তে হলো। তা ছাড়া যখন এ ধরনের কথাবার্তা হচ্ছিল ঠিক সে সময়েই ছয়জন বন্দীর উপর আমার সেই দয়া দেখানোর কথাটি মহারাজের কানে গেল। গোড়া থেকেই মহারাজের এ ব্যাপারে সায় ছিল না। এখন এ খবর পেয়ে মেরে ফেলা দূরে থাক, রাজধানীর ধারে কাছে নয়শো গজের মধ্যে সবগুলো গ্রামের উপর তক্ষুণি হুকুম জারী হয়ে গেল যে প্রত্যেকটি গাঁ থেকে পালা করে রোজ আমার ভোজের জন্য ছয়টা করে ষাঁড়, চল্লিশটা করে ভেড়া, সেই অনুপাতে রুটি-ময়দা আর মদ পাঠাতে হবে। অবশ্য বিনা পয়সায় নয়। প্রতিটি জিনিসের জন্য রসিদ দেওয়া হবে। রাজবাড়ীর খাজাঞ্চি মশাইকে সে রসিদ দেখালেই কড়ায় গণ্ডায় দাম মিটিয়ে দেওয়া হবে।

পরদিনই ফাই-ফরমাশ খাটার জন্য ছয়শো চাকরও আমার ডেরায় এসে হাজির। তাদের থাকার জন্য ধারে কাছেই অনেক তাঁবু খাটিয়ে দেওয়া হলো। আমার গায়ের পুরনো পোশাকটা বরাবরই ওদের অপছন্দ। তা ছাড়া ওটা ময়লাও কম হয় নি। এবার তিনশো দরজীর ডাক পড়লো। দু-এক দিনের মধ্যেই ওদের রুচি মত নতুন পোশাক আমার গায়ে উঠলো। দিন-ক্ষণ দেখে মহারাজ তাঁর ছয়জন বাছা-বাছা পণ্ডিতকে আমার কাছে পাঠালেন। যত্ন করে তাঁরা আমাকে তাঁদের ভাষা শেখাতে লেগে গেলেন। আর একটা অসুবিধে ছিল। মহারাজ বা তাঁর সেনাপতিদের ঘোড়াগুলো আমার সামনে আসতে ভীষণ ভয় পেতো। আমার চেহারাটা ওদের গা-সওয়া হয়ে গিয়ে ভয়টা যাতে ভেঙ্গে যায়, সেজন্যে জন্তুগুলোকে এক জায়গায় করে রোজ দুবেলা আমার সামনে দিয়ে কুচ-কাওয়াজ করানো হতে লাগলো।

ভাষাটা তিন সপ্তাহের মধ্যেই অনেকটা রপ্ত করে ফেললাম। মাঝে মাঝে মহারাজ নিজেও এসে মাস্টারী করতেন, দেখতেন কতদূর এগিয়েছি। মোটামুটি কথা বলতে শিখে, প্রথমেই একদিন মহারাজকে বললাম, এবার আমায় ছেড়ে দিন। অনেকবারই এই কথাটি আমি তাঁর সামনে আওড়ালাম। শুনে কিছু সময় তিনি চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, আপনাকে ছেড়ে দিতে আমার বিশেষ আপত্তি নেই, কিন্তু যে কারণেই হোক এক্ষুণি আমি তা পারছি না বলে দুঃখিত। হয়তো তার আগে আপনাকে শপথ করতে হবে এ দেশে আর কখনো আপনি ফিরে আসবেন না, বা লড়াই-ফড়াই বাধিয়ে উৎপাত শুরু করবেন না।

এখন কিছুদিন এ ভাবেই থাকুন। দেখি আমি কি করতে পারি। তা বলে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আপনার সঙ্গে খুবই ভালো ব্যবহার করা হবে। আমিও আশা করি আপনিও সে-রকমই করবেন।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, আপনার কাছে কোনো অস্ত্রশস্ত্র বা মারাত্মক জিনিসপত্র আছে কিনা দেখা দরকার। সেজন্য প্রথমেই আমার দুজন বিশ্বাসী কর্মচারী আপনার গা ও পকেট খুঁজে দেখবে। আপনার তাতে কোনো বাধা বা ওজর-আপত্তি খাটবে না। লোকদুটি তাদের কাজ করার সময় আপনি ওদের কোনো ক্ষতি করতে পারবেন না। অবশ্য জিনিস আপনার একটিও নষ্ট হবে না। যেভাবে পাওয়া যাবে ঠিক সেই ভাবেই তা ফেরৎ দেওয়া হবে, না হয় তার উচিত দাম ষোল আনা মিটিয়ে দেওয়া হবে।

মহারাজের কথা শেষ হওয়া মাত্র আমি নিজের হাতেই জামার পকেট উলটিয়ে তাঁকে দেখালাম। তারপর লোকদুটিকে আলগোছে তুলে এনে ওভারকোটের পকেটে ঢুকিয়ে দিলাম। একটার পর একটা করে সবগুলো পকেটই তাঁরা দেখলেন। কিন্তু জামার তলায় ফতুয়ার ভেতর দুটো লুকানো পকেট ছিল, তা আর ওঁদের জানতে

দিলাম না। কারণ সেখানে আমার একটা ছোট্ট ঘড়ি, টাকাকড়ি ও এমন কিছু জরুরী জিনিস ছিল যা হাতছাড়া হলে আমার খুবই ক্ষতি হতো।

পকেট থেকে যা যা পাওয়া গেল ফর্দ সমেত সেগুলো ওঁরা সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজের সামনে পেশ করলেন।

ফর্দে জিনিসগুলোর রকম-সকম এ-ভাবে বোঝানো হয়েছিল।

(এক) পাহাড়ের মত মানুষটির বড় জামার ডান পকেটে একখানা মোটা কাপড় পাওয়া গেছে। কাপড়খানা চারকোণ এবং এত বড় যে মহামান্য সম্রাটের রাজপ্রাসাদের সব চেয়ে বড় হল-ঘরের গালিচা হতে পারে। (বোধ হয় বুঝতে পারছেন, এখানে ওরা আমার রুমালখানার কথা বলছে।)

(তুই) বাঁ-দিককার পকেটে পাওয়া গেছে রূপোর তৈরী মস্ত একটি জিনিস যা অনেকটা সিন্দুক বা বাক্সের মত দেখতে। তার ঢাকনিটিও রূপোর। অনেক চেষ্টায়ও তা তোলা বা খোলা যায় নি। শেষে মালিক নিজেই তা খুলে দিলে আমরা তার ভিতরে গিয়ে ঢুকলাম। সেটি ছিল এক রকমের গুঁড়োয় ভরতি। নামা মাত্রই তা উড়ে এসে আমাদের নাকে মুখে ঢোকে। হেঁচে, কেশে প্রায় দম বন্ধ হয়ে আমরা বেরিয়ে আসতে বাধ্য হই। (এখানে ওরা আমার নস্যির কৌটোর কথা বলছে।)

(তিন) আর একটি পকেটে পেলাম, ভাঁজে ভাঁজে রাখা, পাতলা চাদরের মত সাদা রঙের একটা মস্ত বড় বাণ্ডিল। লম্বায় তিন-মানুষের কম নয়। জাহাজের দড়ির মত এক রকম রসি দিয়ে তা বাঁধা ছিল। গায়ে কালো কালির অনেক আঁকি-বুকি ছিল—যা কোনো এক ধরনের লেখা বলে মনে হয়। প্রত্যেকটি অক্ষর প্রায় আমাদের হাতের তালুর

মত বড়। (এখানে ওরা আমার চিঠিপত্র ও খামগুলোর কথা বলছে।)

(চার) পরের পকেটের জিনিসটি আরো অদ্ভুত। অনেকটা ইঞ্জিনের মত লম্বা। তার শিরদাঁড়া থেকে নেমে এসেছে প্রায় কুড়ি-বাইশটি খুঁটি। সেগুলো প্রায় গায়ে গায়ে লাগানো, মাথার দিকে মোটা, গোড়ার দিকে সরু। অনেকটা মহামান্য সম্রাটের প্রাসাদের চারধারের রেলিং-এর মত। শুনলাম ওটা দিয়ে লোকটি তার ইয়া-লম্বা চুলগুলো আঁচড়ায়।

(পাঁচ) এর পর পা'জামার দুপাশে দুটি লম্বা পকেট। এক নম্বর পকেটে পাওয়া গেল আরো দুটি অদ্ভুত জিনিস। সামান্য কিছু ছোট বড় ছাড়া প্রায় একই রকম দেখতে। বাঁকা ও তেরচা ধরনের বড় একখণ্ড কাঠের টুকরোর মাথায় এক মানুষ লম্বা একটি লোহার নল লাগানো। কাঠের দিকটা নলের চেয়ে কিছু বড়। নলের গোড়ার দিকে আর একটি লোহার টুকরো হেলানো ভাবে ঝুলছে। সেটিও খুব ছোট-খাট নয়। জিনিস দুটির গড়নও অদ্ভুত। কি কাজে লাগে তাও আমাদের অজানা। (এখানে ওরা আমার পিস্তল দুটির কথা বলছে।) এ ছাড়াও আরো কিছু গোল ও চ্যাপ্টা ধরনের জিনিস সেখানে ছিল। সেগুলো নানা মাপের। কিছুর রঙ সাদা, কিছুর হলদে। এক একখানা এত ভারী যে তুলতে দম বেরিয়ে যাবার যোগাড়।

দু'নম্বর পকেটে ছিল বিদঘুটে ধরনের এক জোড়া চ্যাপ্টা জিনিস। এক একটা এত লম্বা যে পকেটের তলায় দাঁড়িয়ে আমরা তাদের মাথা ছুঁতে পারিনি। মনে হচ্ছিল ওদের খাপের ভেতর বিরাট লোহার ফলা লুকোনো আছে। পাহাড়ের মত মানুষটি বলছিল যে এদের একটি

দিয়ে সে দাড়ি কামায় আর একটি দিয়ে খাবার সময় মাংস কাটে।

(ছয়) লোকটির বুকপকেটে আগে থেকেই একটি রূপোর চেন ঝুলছিল। সে নিজেই তা টেনে বার করলো। চেনের আর এক মাথায় লাগানো যে জিনিসটি এবার দেখলাম, তার চেয়ে আশ্চর্য কিছু আর কখনো দেখিনি। এটিও দেখতে গোলাকার ও চ্যাপ্টা। আধখানা রূপোর আর বাকি আধখানা যে কিসের, বলতে পারবো না। কিন্তু তার উপর থেকে চোখ ফেললে ভেতরের সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায়। জিনিসটার পেটের মধ্যে সর্বদাই একটা শব্দ হচ্ছিল। আমাদের দেশে জলের তোড়ে যে সব কল চলে, ঠিক তাদের মত আওয়াজ। ভেতরে হয়তো কোনো জন্তু-জানোয়ার লুকিয়ে আছে, না হয় কোনো ঠাকুর-দেবতা। ঠাকুর-দেবতা হওয়াই সম্ভব। কারণ লোকটি বলছিল রোজ ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই সে নাকি এই জিনিসটির দিকে তাকায় আর প্রত্যেকটি কাজকর্মই এর ইশারা মতন করে।

(সাত) লোকটির কোমর-বন্ধটি নিশ্চয়ই বিশাল কোনো জানোয়ারের চামড়ায় তৈরী। তার বাঁ-দিকে ঝুলছিল প্রায় পাঁচ-মানুষ লম্বা একখানা তরোয়াল, আর ডান দিকে একটি থলে। থলের ভেতর দুটি খোপ। তার এক একটির মধ্যে মহামান্য সম্রাটের তিন-চারজন প্রজা অনায়াসে লুকোচুরি খেলতে পারে। এক খোপে অনেকগুলো বলের মত জিনিস পেলাম। কি ধাতুতে তৈরী জানি না। তবে এক একটা প্রায় এদেশের যে কোনো জোয়ান লোকের মাথার মত বড়, আর এত ভারী যে পালোয়ান না হলে তোলাই শক্ত। আর এক খোপে ছিল কুচকুচে কালো

রঙের এক গাদা গুঁড়ো। তার পঞ্চাশটি দানা তুললেই আমাদের তুহাতের আঁজলা ভরে যায়। (এখানে ওরা আমার পিস্তলের কার্তুজ ও বারুদের কথা বলছে।)

ফর্দটি এখানেই শেষ। তারপর লেখা ছিল, 'মহামান্য সম্রাটের হুকুমে পাহাড়ের মত মানুষটির শরীর তন্ন-তন্ন করে খুঁজে যে সব মাল পাওয়া গেল, তার পুরোপুরি তালিকা সাত দফায় পেশ করা হলো। এই সঙ্গে আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে সম্রাটের পদস্থ আমলাদের প্রতি যে ভদ্রতা ও সম্মান দেখানো উচিত লোকটি আমাদের সঙ্গে সে রকম ব্যবহারই করেছে। মহারাজের জয় হোক। ইতি।'

সেইদিনই, অর্থাৎ সম্রাট বাহাতুরের শুভ রাজত্বের উননব্বই মাসের চার তারিখে, কাগজটি সই ও সীল মোহর করা হলো। আমার জিনিসপত্র সমেত সেটিকে রাজবাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। একটি নকল অবশ্য আমিও পেলাম।

জিনিসগুলো চলে যাওয়ার সময় আমার যে কি মন খারাপ লাগছিল, তা বলে বোঝানো যায় না। এতদিনের প্রিয় তরোয়াল-খানা হাতছাড়া করতেই কষ্ট হচ্ছিল সবচেয়ে বেশী। সমুদ্রের নোনাজলে কিছু মরচে পড়লেও তার জেল্লা বিশেষ কমেনি। খাপ থেকে খুলে যখন সেটি মহারাজের সামনে রাখি, তাঁর সেপাইশান্ত্রীরা তীরধনুকে সেজেগুজে আমাকে ঘিরে দাঁড়ালো। দেবার আগে, শেষবারের মত কয়েকবার সেটিকে শূন্যে না ঘুরিয়ে পারলাম না। চকচকে ধারালো ফলার উপর সূর্যের আলো পড়তেই সকলের চোখ ধাঁধিয়ে দিলো। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এমন বিকট শব্দে ওরা চেঁচিয়ে উঠলো যে অমন সাহসী মহারাজ বাহাতুর পর্যন্ত হকচকিয়ে গেলেন।

পিস্তল তুটির বেলাও সেই একই কষ্ট। জমা দেবার আগে ওদের চালানোর ফন্দি-ফিকিরও মহারাজকে দেখাতে হলো।

আমি সকলকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে আকাশের দিকে তাক করে গুলী ছুঁড়লাম। কিন্তু আওয়াজ হতেই কানে তালা লেগে, ভিরমি খেয়ে 'ওরে বাবারে' বলে হাজার হাজার মানুষ সেখানেই লুটিয়ে পড়লো। মহারাজ ততটা না হলেও বেশ কিছুক্ষণ থ' হয়ে রইলেন।

গোলা-বারুদগুলোর ব্যাপারে বার বার সাবধান করে দিলাম, যেন ওগুলো আগুনের ধারে কাছেও না আনা হয়, তাহলে গোটা রাজবাড়ীটাই ফেটে-ফুটে চুরমার হয়ে যাবার ভয় আছে।

মহারাজের নজর কিন্তু সবচেয়ে বেশী পড়েছিল আমার ঘড়িটার উপর। এমন জিনিস তিনি জীবনে কখনো দেখেননি। তাছাড়া, ওর ভেতরকার ঐ আওয়াজটাই ওকে অবাক করেছিল সবচেয়ে বেশী। মিনিটের কাঁটাটার দিকেও অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিতদের ডেকে আনলেন। এটা কি ওটা কি, জিনিসটা কি ভাবে বানানো, অনেক কিছু প্রশ্ন করলেন। বলবে কি ? তারাও সব বোকার মত ফ্যাল-ফ্যাল করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে নখ খুঁটতে লাগলো।

চার

নিজের গুণে অল্পদিনের মধ্যেই আমি সকলেরই খুব প্রিয় হয়ে উঠলাম। লোকজনের মন থেকে ভয়ের ভাবটা কেটে গেল। বেশ প্রাণ খুলে তারা আমার সঙ্গে মেলামেশা করতে লাগলো। অনেক সময় এক সঙ্গে আমি তাদের পাঁচ-ছ'জনকে মাথায় তুলে নিতাম। তারাও আমার কপালের উপর দিব্যি নাচগানের আসর জমাতো। শেষ মেশ বাচ্চারা পর্যন্ত পিছিয়ে থাকতো না। হাসতে হাসতে মাথায় উঠে আমার লম্বা চুলগুলোর ভেতর লুকোচুরি খেলা শুরু করতো।

মহারাজ ও তাঁর দরবারের মন্ত্রী-মশাইরা এমন কি সেনা ও সেনাপতিরাও আমার উপর খুব সদয় হয়ে উঠলেন।

দেখে শুনে খুব আশা হলো এবার হয়তো ছাড়া পেয়ে যাবো।

মহারাজের কাছে পর পর কয়েকটি দরখাস্তও দিলাম। কিন্তু ভাগ্যের গেরো, কেন জানি না, তাঁর নৌ-বিভাগের একজন প্রধান সেনাপতি আমার উপর আগাগোড়াই খুব নারাজ ছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই বাধা আসতে লাগলো সবচেয়ে বেশী। সকলের কথায় শেষে তিনি কিছুটা নরম হলেন বটে, কিন্তু বললেন, ছেড়ে দিতে পারি, কিন্তু একেবারে অমনি অমনি নয়। তার আগে আমাকে কতকগুলো শর্ত ঈশ্বরের নামে মেনে নিতে হবে। শর্তগুলোও তিনি নিজেই লিখবেন এবং আমাকে পড়ে শোনাবেন। মহারাজেরও ইচ্ছা আমি তাই করি। কাজেই রাজী না হয়ে আর উপায় কি!

একদিন তাঁরা সকলেই আমার কাছে এলেন। আমিও তৈরী হয়ে দাঁড়ালাম। শপথ নেবার কাজটি আমাকে দুবার করতে হলো। একবার আমার দেশের নিয়মে, আর একবার ওদের মত

করে। ওদের নিয়মটা অদ্ভুত। প্রথমে আমার ডান পাখানা তুলে বাঁ হাতের উপর রাখতে হলো, তারপর ডান হাতের মাঝের আঙুলটি কপালে ঠেকিয়ে সেই সঙ্গে বুড়ো আঙুল দিয়ে ডান কানের লতিটি চেপে ধরে কথাগুলো পড়ে যেতে হলো।

শর্তগুলো কি বা কেমন, এবং দফায় দফায় কি ভাবে তা লেখা হয়েছিল, খসড়া থেকে তার হুবহু নকল আমি নীচে তুলে দিলাম। ভূমিকাটি শুরু হয়েছিল এই ভাবে,—

'একাধারে জগতের আনন্দ ও ভয়ের আধার, পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছড়ানো পাঁচ মাইল মহাসাম্রাজ্যের মালিক, দুনিয়ার সব মানুষের চেয়ে উঁচু, সব রাজাদের রাজা, পা রেখে দাঁড়ালে যাঁর মাথা অনায়াসে আকাশে গিয়ে ঠেকে, যিনি মাথাটি নাড়া দেওয়া মাত্র দুনিয়ার সমস্ত রাজপুত্রের হাঁটু ঠক-ঠক করে কাঁপে, বসন্তকালের মত সুন্দর, গ্রীষ্মকালের মত মধুর, শরৎকালের মত ফলবান, শীতের মত ভয়ংকর, লিলিপুট মহাদেশের এই মহামান্য ও মহাবীর সম্রাট অনুগ্রহ করে প্রস্তাব করছেন যে এদেশের এই নতুন অতিথি ঐ পাহাড়-প্রমাণ মানুষটি এই চুক্তিনামায় লেখা প্রত্যেকটি শর্ত ধর্ম ও ঈশ্বরের নামে মেনে চলতে বাধ্য থাকবে।

রাজ্যের মঙ্গলের জন্য মাননীয় সম্রাটের পবিত্র 'ব্যাল্‌ফোরাক' প্রাসাদ থেকে তাঁর রাজত্বের একানব্বই মাসের বারো দিনের দিন সীল মোহর দিয়ে এই চুক্তিনামা সই করা হলো। ইতি।

(এক) মহামান্য সম্রাটের লিখিত ছাড়পত্র ছাড়া ঐ লোকটির পক্ষে আমাদের রাজ্যের বাইরে এক পাও যাওয়া চলবে না।

(দুই) বিনা হুকুমে সে আমাদের রাজধানীতেও ঢুকতে পারবে না। হুকুম পেলেও ঢোকার আগে তাকে অন্তত দু'ঘণ্টা দেরী করতে হবে, যাতে শহরের সকলেই সেই ফাঁকে যার যার বাড়ীর মধ্যে গিয়ে নিরাপদে আশ্রয় নিতে পারে।

(তিন) রাজ্যের বড় বড় রাস্তাগুলোতেই কেবল সে চলাফেরা

করতে পারবে। কোনো কারণেই কোনো খোলা মাঠ বা খেত-খামারের উপর সে খুশিমত ঘুরে বেড়াতে বা শুয়ে থাকতে পারবে না।

(চার) হাঁটা-চলার সময় তাকে সর্বদা হুঁশিয়ার থাকতে হবে, যেন আমাদের কোনো লোকজন বা গাড়ী-ঘোড়া তার পায়ের তলায় পড়ে খুন-জখম না হয়।

(পাঁচ) কেউ নিজে থেকে না চাইলে কখনো কাকেও জোর করে সে তার হাতের উপর তুলে নিতে পারবে না।

(ছয়) তাকে আমাদের খাঁটি বন্ধু হতে হবে। পাশের ব্লেফুসকো দ্বীপের রাজা জলপথে আমাদের দেশ আক্রমণের জন্য তৈরী হয়ে আছে। যে করেই হোক, ওদেশের গোটা নৌ-বহর নষ্ট করে দিয়ে, তাকে সেই বন্ধুত্বের প্রমাণ দিতে হবে।

(সাত) রাজধানীর কোনো জরুরী হুকুম দূরে কোথাও পাঠানোর দরকার হলে, মাসে অন্ততঃ একবার সেই পিওনকে তার ঘোড়া সমেত পকেটে নিয়ে সেখানে পৌঁছে দিতে হবে। ছ'দিনের পথ হাঁটতে হলেও সে না বলতে পারবে না।

(আট) শহরের বড় বাগিচা আর রাজবাড়ীর চারধারে যে নতুন পাঁচিল তোলা হচ্ছে, তার জন্য পাথর বয়ে দিয়ে, মাঝে মাঝে তাকে রাজমিস্ত্রীদের সাহায্য করতে হবে।

(নয়) হেঁটে হেঁটে দুমাসের মধ্যে নিজের পায়ের মাপে এ রাজ্যের আগাগোড়া সীমানাটা তাকে জরিপ করে ফেলতে হবে।

(দশ) ওপরে লেখা প্রত্যেকটি কথা ঈশ্বরের নামে মেনে চললে তাকে রোজ দুবেলা এদেশের এক হাজার সাতশো চল্লিশজন লোকের মত খাবার-দাবার দেওয়া হবে। তা ছাড়াও ইচ্ছে মত রাজপ্রাসাদে যাওয়া ও আরো অনেক সুখ-সুবিধে সে ভোগ করতে পারবে।

নৌ-বিভাগের ঐ বজ্জাত সেনাপতিটির জন্যই শর্তগুলোর মধ্যে কয়েকটি আমার পক্ষে খুব সম্মানের হলো না। তবু কথাটি না বলে আমি তাতে সই করে দিলাম। মাথা নুইয়ে সম্রাটকে নমস্কার ও ধন্যবাদ জানালাম। সম্রাটও বেশ খুশি হলেন বলেই মনে হলো। বললেন, এখন থেকে আমি তাঁর প্রিয় প্রজার মতন মনে প্রাণে এ দেশের সেবা করে যাবো, এ আশাই তিনি করেন।

সঙ্গে সঙ্গেই আমার পায়ের শেকল খুলে দেওয়া হলো। অনেক-দিনের বন্দী দশা থেকে আমি মুক্তি পেলাম।

পাঁচ

ছাড়া পাবার পর প্রথমেই রাজধানীটি দেখতে চাইলাম। শহরটির নাম মিলেণ্ডো। সঙ্গে সঙ্গেই লোকজনদের সে কথা জানিয়ে দেওয়া হলো। তারাও যে যার ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো।

শহরের চারদিক আড়াই ফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলটি চওড়ায়ও এক ফুটের উপর। গাড়ী সমেত একজোড়া ঘোড়া তার উপর অনায়াসে দৌড়াদৌড়ি করতে পারে। পাঁচিলের গায়ে দশ ফুট পর পর একটি করে বুরুজ। আমি খুব সাবধানে পশ্চিমের বড় ফটকটি ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকলাম।

বাড়ী থেকেই আমি আমার ভারী ওভারকোটটা ছেড়ে শুধু ফতুয়া গায় দিয়ে বেরিয়েছিলাম। এখন দেখছি ভালোই করেছিলাম। নইলে ওটার ঘষটানিতে বাড়ীগুলোর ছাদ বা কার্নিশের খুবই ক্ষতি হতো। আমাকে দেখার জন্য প্রতিটি বাড়ীর জানালায়, বারান্দায় ও ছাদে এত লোক জমা হয়েছিল যে মানুষের মাথায় মাথায় সব একাকার মনে হচ্ছিল। সত্যি এমন লোক-গিস্‌গিস্‌ শহর আর দেখিনি।

শহরটি চার-কোণা, বেশ সাজানো-গোছানো। এক এক দিকের দেয়ালের বেড় পাঁচশো ফুট করে। বড় রাস্তা মোটে দুটি। প্রত্যেকটি পাঁচ ফুট চওড়া। একটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বি, আর একটি পূবে-পশ্চিমে আড়াআড়ি। মাঝখানে কাটাকাটি করে শহরটিকে চারটি সমকোণে ভাগ করেছে। অলি-গলিও কম নয়। তবে তাদের ভেতর ঢোকা অসম্ভব। চওড়ায় বারো ইঞ্চি, খুব বেশী তো আঠারো। পাঁচ লক্ষ মানুষ এখানে থাকে শুনলাম। বাড়ী-ঘর

বেশীর ভাগই তিন থেকে পাঁচ তলা। দোকান-বাজারও বেশ দেখবার মত।

শহরের একেবারে মাঝখানে, ছুটি বড় রাস্তার মোড়ে রাজ-প্রাসাদ। তারও চারধারে প্রায় ছ'ফুট উঁচু পাঁচিল। এপারে কুড়ি ফুটের মধ্যে কোনো বাড়ী-ঘর নেই। বেশ ফাঁকা। প্রাসাদ দেখারও আমার হুকুম ছিল। দেয়াল ডিঙিয়ে ওপারে চলে গেলাম। আগে-পিছে ছুটি চারকোণ চত্বর। সে ছুটিও বেশ বড়-সড়ো। সেখানে স্থন্দর বাগানের মধ্যে পরপর ছুটি দোতলা দালান। পিছনেরটিতেই সম্রাট নিজে থাকেন, অর্থাৎ খাসমহাল। সেটি দেখার জন্যই ছটফট করছিলাম বেশী, কিন্তু এ দালান থেকে ও দালানে যাওয়ার জন্য চত্বরে যে ছুটি ফটক ছিল উঁচুতে মোটে দেড় ফুট আর চওড়ায় সাত ইঞ্চি। ওদের কাছে পেল্লায়, কিন্তু আমার কাছে ইঁত্বরের গর্ত। সামনের দালানের ওপর দিয়ে অবশ্য ওপাশে গিয়ে পড়া যায়। যদিও সেটি পাঁচ ফুটের মত উঁচু আর চার ইঞ্চি পুরু শক্ত পাথরে তৈরী তবু সাহস পেলাম না। কি জানি ভার সইতে পারবে কিনা কে জানে?

মহারাজারও খুব ইচ্ছে ছিল তাঁর ঐ স্থন্দর মহালটি আমি দেখি। কিন্তু এ যাত্রা আর হলো না।

শহর থেকে প্রায় একশো গজ দূরে মহারাজার একটি বাগান ছিল। সেখান থেকে বড় বড় দেখে কয়েকটা গাছ কেটে আনলাম। তারপর তাদের কাঠ দিয়ে তিন ফুট উঁচু পাকা-পোক্ত ছুটি টুল তৈরী করে ফেললাম। তিনদিনের দিন সে ছুটি হাতে করে আবার রাজ-বাড়ীতে গিয়ে ঢুকলাম। ফন্দীটি মাথায় পাকানোই ছিল। একটি টুলের উপর দাঁড়িয়ে আর একটিকে তুলে নিলাম। দালানের ওপর হামা দিয়ে সেটিকে ওপাশে নামিয়ে দিলাম। এবার লম্বা পায়ে ছাদ ডিঙিয়ে একেবারে এ টুল থেকে ও টুলে, তারপর মাটিতে। ওখানে ছুটি দালানের মাঝখানে আট ফুট আন্দাজ ফাঁকা। কিন্তু

মহলের দোর-জানালাগুলো এত নীচু যে দাঁড়িয়ে কিছু দেখা যায় না। শুয়ে না পড়লে ওরা চোখের গোড়ায় আসে না। দোর-জানালা-গুলো আমার জন্য খুলেই রাখা হয়েছিল। শুয়ে শুয়ে বেশ করে ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখলাম। হ্যাঁ দেখবার মতই বটে। প্রত্যেকটি কামরা এমন জমকালো আর নিখুঁত ভাবে সাজানো যে না দেখলে ধারণা করা যায় না। মহারানী ও রাজকুমাররাও দাস-দাসী নিয়ে যে যার ঘরে বসে ছিলেন। আমাকে দেখে সবাই খুব খুশি। মহারানী মিষ্টি হেসে জানালা গলিয়ে তাঁর হাতখানি বের করে দিলেন। নিয়ম মাফিক মাথা নীচু করে আমি তা আমার ঠোঁটের গোড়ায় তুলে ধরলাম।

এর মধ্যে একদিন মহারাজের গোপন মন্ত্রণা-সভার প্রধান সচিব মশাই গাড়ী হাঁকিয়ে আমার আস্তানায় এসে হাজির। আমার সঙ্গে ভয়ানক জরুরী একটা কথা আছে। তিনি যা বললেন তার অর্থ এই যে 'ব্লেফুসকো'র লিলিপুট আক্রমণ যে কোনো মুহূর্তে শুরু হয়ে যেতে পারে। ওদের জোরালো নৌ-বহরকেই সম্রাটের বেশী ভয়। এ অবস্থায় তিনি আমার উপরই ভরসা করে আছেন। তাঁর ইচ্ছা, যে কোনো উপায়ে তাঁকে সাহায্য করার জন্য আমি যেন তৈরী থাকি।

আমিও সচিব মশাইকে বললাম, দয়া করে সম্রাটকে আমার শত কোটি নমস্কার জানিয়ে বলবেন যে তাঁর শত্রুদের হারিয়ে বা তাড়িয়ে দেবার জন্য দরকার হলে আমি প্রাণ দিতেও পিছ-পা হবো না। ভদ্রলোক নিশ্চিন্ত হয়ে বার বার ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় হলেন।

ছয়

লিলিপুটের উত্তর-পূবে আটশো গজ চওড়া একটি সমুদ্রের খাড়ি। তার উপর ছোট্ট এক টুকরো দ্বীপ, ব্লেফুসকো। জায়গাটি আমি দেখিনি। কিছুদিন ধরে দু দেশের মধ্যে লোক চলাচল, ব্যবসায়-বাণিজ্য—এক কথায় মুখ দেখাদেখি বন্ধ ছিল; দুটি শত্রু দেশের মধ্যে যা হয়। কাজেই আমার খবর যে ওখানে কেউ পেয়েছে এমন মনে হলো না।

গুপ্তচরের মুখে শুনেছিলাম ওদের যুদ্ধজাহাজগুলো দল পাকিয়ে পোতাশ্রয়ের মধ্যে নোঙর করে আছে। মাথায় একটা মতলব নিয়ে এ দেশের পাকা মাঝি-মাল্লাদের ডেকে খাড়িটি কতখানি গভীর জিজ্ঞেস করলাম। তারা বললে, জোয়ারের সময় মাঝখানে ছ'ফুট আর চারদিকে চার ফুটের মত জল থাকে।

সবার চোখ এড়িয়ে একদিন হাঁটতে হাঁটতে খাড়ির পাড়ে গিয়ে দাঁড়ালাম। দ্বীপটি দেখা যাচ্ছিল। খাড়ির লাগোয়া ছোট্ট একটি পাহাড়। তার পেছনে গা-ঢাকা দিয়ে, দূরবীণ ধরে ওদের জাহাজ-গুলোকে লক্ষ্য করলাম। হ্যাঁ, প্রায় পঞ্চাশখানা জাহাজ একসঙ্গে জলের উপর দাঁড়িয়ে আছে। ছোট ছোট আরো অনেকগুলো মাল-টানা জাহাজ তাদের ঘিরে আছে।

বাড়ী ফিরে এসেই লোকজন ডেকে হুকুম দিলাম, লে আও গোছা-গোছা কাছি আর গাদা খানেক লোহার ডাণ্ডা। মালগুলো হওয়া চাই পয়লা নম্বরের সেরা আর মজবুত। (এ রকম হুকুম-সুকুম দেবার অধিকার আমাকে আগেই দেওয়া হয়েছিল।)

কিছুক্ষণের মধ্যেই সব এসে হাজির। কাছিগুলো আমাদের দেশের ছিপের সুতোর মত, কিন্তু মোক্ষম শক্ত। ডাণ্ডাগুলোও

কুরুশ-কাঁটার মত। তিন তিনটে করে দড়ি এক সাথে পাকিয়ে আরো পোক্ত করে ফেললাম আর ডাণ্ডাগুলোও গোটা চারেক এক সঙ্গে পেঁচিয়ে মাথার দিকটা বড়শীর মত বেঁকিয়ে দিলাম। তারপর গোটা পঞ্চাশেক দড়ির মাথায় বড়শীগুলো বেঁধে, ঘাড়ে ঝুলিয়ে খাড়ির পাড়ে এসে চুপি চুপি জলে নেমে পড়লাম।

জোয়ারের তখনো আধঘণ্টা বাকি ছিল। যতদূর পারি জল ভেঙে হাঁটলাম, তারপর সাঁতার দিতে হলো। পায়ের তলায় যখন মাটি ঠেকলো তখন জাহাজগুলোর এক্কেবারে কাছে এসে পড়েছি। ঠিক সেই সময়েই জাহাজের লোকেরা আমাকে দেখতে পেলো। হঠাৎ এমন একখানা মূর্তি দেখে ভয়ে দিশেহারা হয়ে দলে দলে তারা জলে ঝাঁপ দিয়ে মরি-বাঁচি করে পারের দিকে সাঁতরাতে লাগলো। প্রায় হাজার তিরিশেক লোকের এই হাল হলো। আমিও সেই সুযোগে প্রত্যেকটি জাহাজের সামনের গলুইতে বড়শীগুলো গেঁথে, দড়ির অন্য মাথাগুলো চটপট এক জায়গায় বেঁধে ফেললাম। এবার গেরো ধরে টেনে হিড়হিড় করে জাহাজগুলো লিলিপুটের কূলে এনে ফেলা। প্রথম টান দিতেই বুঝলাম কাজটা যত সহজ হবে ভেবেছিলাম, তা নয়। জাহাজগুলো খুব শক্ত করে নোঙরের সঙ্গে বাঁধা। কাজেই আর একটা কঠিন কাজের ঝুঁকি নিতে হলো। প্রতিটি জাহাজের কাছে গিয়ে তার নোঙরের কাছিটি কেটে দিয়ে আসতে হবে। এর মধ্যে ওরাও আবার দল বেঁধে এগিয়ে এসেছে। আমার সারা গায়ে, চোখে মুখে হাজার হাজার তীর এমন ভাবে এসে পড়তে লাগলো যে যন্ত্রণায় আমি চোখে সরষে ফুল দেখতে লাগলাম। ভাগ্যিস আমার চোখে চশমা আঁটা ছিল, নইলে চোখ দুটির কি হাল হতো কে জানে? কিন্তু একবার যখন নেমে পড়েছি, তখন তো আর পিছিয়ে আসা যায় না। যা হোক করে কাজটা শেষ করে ফেললাম।

প্রথমটা আমার কাণ্ড-কারখানা দেখে ওরা মনে করেছিল,

হয়তো নোঙরের দড়ি কেটে জাহাজগুলোকে আমি মাঝ দরিয়ায় ভাসিয়ে দিতে যাচ্ছি। কিন্তু যখন দেখলো, না, সেগুলো লিলিপুটের দিকে চলেছে তখন রাগে, দুঃখে, নিরাশায় সবাই মিলে গলা ফাটিয়ে এমন চীৎকার শুরু করলো যে আমার কানে তালা লেগে গেল।

সম্রাট তার দলবল নিয়ে তীরের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। আধ-খানা চাঁদের মত গোল হয়ে জাহাজগুলো ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল। আমার মাথাটি মাত্র বাইরে, আর সবই জলের তলায়। প্রথমটা ওঁরা আমাকে দেখতে না পেয়ে ভেবেছিলেন আমি হয়তো ডুবে মরেছি, শত্রুপক্ষের জাহাজগুলোই আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছে। কিন্তু পারের কাছে আসতেই ওঁরা আমাকে দেখতে পেলেন এবং আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেলেন। পারে উঠে আসতেই সম্রাট ধন্যবাদের সঙ্গে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই ওদেশের সবচেয়ে বড় পদবীতে অর্থাৎ লর্ড উপাধিতে ভূষিত করলেন।

কিন্তু এই পঞ্চাশটি যুদ্ধজাহাজেই তিনি খুশি নন। তাঁর ইচ্ছা, এক্ষুণি আমি আবার গিয়ে ওদেশের সব জাহাজকেই এমনি করে নিয়ে আসি। কিন্তু আমি তখন ধুঁকছি। তা ছাড়া আসল শক্তির উপরই যখন ঘা দিয়েছি তখন শুধু শুধু আর ওসব করে কোন লাভ নেই মনে করে সম্রাটের কথায় আমি রাজী হলাম না। বুঝলাম তিনি আমার উপর খুব নারাজ হলেন। কিন্তু উপায় কি?

এই সব রাজা-রাজড়ার মতিগতি বোঝাই ভার। যতই তাঁদের সেবা করো, একবার পান থেকে চুনটি খসলেই, ব্যস্, আর সে কথা তাঁদের মনে থাকে না। জীবন পণ করে এই যে এ ভাবে আমি তাঁর দেশ বাঁচিয়ে দিলাম, একটুতেই চটে গিয়ে তিনি যে সেই উপকারের কথাই শুধু ভুলে গেলেন তাই নয়, তলে তলে কারো কারো উস্কানীতে আমার প্রাণনাশের চেষ্টা করতে লাগলেন। সে কথা এখন নয়, সময় মত বলবো।

যা হোক এ ঘটনার তিন সপ্তাহ পরেই ব্লেফুসকোর রাজা লিলিপুটে দূত পাঠিয়ে সম্রাটের সঙ্গে সন্ধি করলেন। সন্ধির শর্তও সব সম্রাটের সুবিধে মতই করা হলো। এক কথায় আমার জন্য বিনাযুদ্ধেই লিলিপুটের জয় হলো। কিন্তু সম্রাটের সেই গোমড়া-মুখো ভাব কিছুতেই দূর হলো না।

কিন্তু এরই মধ্যে এমন একটি কাণ্ড ঘটলো যে জন্য আবার তাঁকে আমার কাছে ছুটে আসতে হলো। মহারানীর মহালে তাঁর এক দাসী রাতে আলো জ্বেলে বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ কি ভাবে বাতিটা উল্টে পড়ে তার ঘরে আগুন লেগে যায় এবং দেখতে দেখতে সে আগুন মহারানীর খাস-কামরায়ও গিয়ে ঢোকে। সে আগুন কিছুতেই নেভানো যাচ্ছে না দেখে দরবারের কয়েকজন গণ্যমান্য লোক আমার কাছে ছুটে এলেন।

গিয়ে দেখি, মহালের গায়ে মই লাগিয়ে হাজার হাজার লোক বালতি করে জল এনে ঘরের ভেতর ছিটাচ্ছে। কিন্তু জল একেবারে ধারে কাছে নয়। আগুন বেড়েই চলেছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। আমাদের দেশে দরজীরা সেলাই করার সময় আঙ্গুলে যে লোহার টুপী বা টোপর পরে নেয় বালতিগুলো তার চেয়ে বড় নয়। তাতে করে দূর থেকে জল টেনে এনে কত-ক্ষণে এ আগুন নিভবে? আহা, যদি আমার জোব্বা ওভারকোটটাও থাকতো, তবে সেটা দিয়ে ঝেঁটিয়েই এক্ষুণি এ আগুন নিভিয়ে ফেলা যেতো। আহা, এমন সুন্দর প্রাসাদটা পুড়ে শেষ হয়ে যাবে? হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। এক দৌড়ে, যে পুকুর থেকে জল টেনে আনা হচ্ছিল, সেখানে গিয়ে পাড়ের উপর উবু হয়ে মুখ ভরতি জল টেনে নিলাম। তারপর প্রাসাদের যে দিকে আগুনটা সবচেয়ে জোরে জ্বলছিল, সেখানে কুলকুচোর মত সেই জলটা ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিলাম। কথায় বলে হাতুড়ির ঠুক ঠুক, কামারের এক ঘা। আমার এক মুখ জলে ওদের প্রায় পঞ্চাশ বালতি। দেখতে দেখতে

আগুন থিতিয়ে এলো। আরো দু'একবার ও রকম করতেই একেবারে নিভে গেল। আমার উপস্থিতবুদ্ধিতে শুধু রানীমহালটাই বাঁচলো, তা নয়, প্রাসাদের অন্যান্য অংশ এমন কি মহারানীর জীবনও রক্ষা পেলো।

ততক্ষণে ভোর হয়ে গিয়েছে। ভেবেছিলাম মহারাজ হয়তো খুশি হয়ে আমাকে ধন্যবাদ জানাতে আসবেন। কিন্তু তিনি এলেন না। শুনলাম খুশি ও কৃতজ্ঞ হওয়া তো দূরের কথা, মহারাজ ও মহারানী দুজনেই আমার উপর আরো বেশী রাগ ও বিরক্ত হয়েছেন। ওদেশের আইনে নাকি রাজপ্রাসাদ ও তার সীমানার ভেতর কেউ থুথু ফেললে, যত গুণী মানী লোকই হোক না কেন, তার শাস্তি প্রাণদণ্ড। আমার এ ভাবে আগুন নেভানোটাও থুথু ছিটানোর সঙ্গে সমান করেই দেখা হয়েছিল। খুব মনমরা হয়েই বাসায় ফিরে এলাম। আমিই বা কি ভেবে করলাম আর তার মানেটাই বা ওঁদের চোখে কি ভাবে দাঁড়ালো!

যাহোক দু'একদিনের মধ্যে সম্রাটের একটি চিঠি পেয়ে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। তিনি লিখেছেন, যদিও কাজটি আমার পক্ষে খুবই অন্যায় হয়েছে তবু যে অবস্থায় ও যে ভালো উদ্দেশ্যে আমি তা করতে বাধ্য হয়েছিলাম, সে কথা মনে করে তিনি তাঁর প্রধান বিচারককে আদেশ দিয়েছেন যেন আমাকে ক্ষমা করা হয়। কিন্তু অনেকদিন অপেক্ষা করেও সরকারীভাবে আদালত থেকে এ রকম কোনো চিঠি আমার কাছে এলো না, বরং কানাঘুসায় এ কথাই শুনলাম যে মহারানী আমার উপর এত রেগে গেছেন যে অপবিত্র মনে করে ঐ প্রাসাদ ছেড়ে তিনি অন্য জায়গায় উঠে গেছেন। মেরামত না করে ওটাকে পড়োবাড়ীর মতই ফেলে রাখা হয়েছে। আরো শুনলাম, আমার উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তিনিও উঠে পড়ে লেগেছেন।

সাত

দিন দিনই মন ভেঙে পড়ছিল। ন'মাস তেরো দিন হলো এদেশে এসেছি। একটি দিনের জন্যও শান্তি পাইনি। কবে সেই দেশ থেকে বেরিয়েছি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কত দিন দেখা হয় না, কবে যে হবে ঈশ্বরই জানেন। তার উপর রাজ-প্রাসাদের এসব নোংরা ব্যাপার আমাকে একেবারে সহ্যের শেষ সীমায় এনে ফেলেছিল। যে করেই হোক এখান থেকে পালাতেই হবে। কিন্তু কোথায় যাবো? আপাতত ব্লেফুসকো দ্বীপেই গিয়ে পাড়ি জমাই, তারপর দেখা যাবে। কথাটা সম্রাটকেও বললাম। তিনি হ্যাঁ বা না কিছুই বললেন না, কিন্তু মুখ দেখে তাঁর যে খুব অমত আছে তাও মনে হলো না। বরং তিনি রাজী আছেন মনে করে জিনিসপত্রও বাঁধা-ছাঁদা করতে লাগলাম। দু-এক দিনের মধ্যেই রওনা হবো।

হঠাৎ সেদিনই রাত্রিবেলা মহারাজের চেনা-মহলের একজন হোমরা-চোমরা লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ভদ্রলোক আমাকে খুব ভালবাসতেন। খুব লুকিয়ে চুরিয়ে তিনি এলেন, আবার সেই ভাবেই চলেও গেলেন। তিনি বললেন, এমন একটি কথা বলার জন্য তিনি এসেছেন যার সঙ্গে আমার জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়ানো। এক নম্বর, ব্লেফুসকোর ব্যাপারে আমি মহারাজের হুকুম মানিনি আর দু'নম্বর, রাজবাড়ীতে ওভাবে জল ছিটিয়েছি বলে সবাই আমার উপর খাপ্পা হয়ে আছেন। তার উপর এখন আবার ব্লেফুসকোতেই যেতে চাইছি বলে ওদের ধারণা হয়েছে সেখানকার রাজার সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে নির্ঘাত আমি লিলিপুট আক্রমণের ফন্দী আঁটছি। মহারানী আর ঐ সেনাপতি সাহেবই এই ঘোঁট

পাকানোর প্রধান পাণ্ডা। মহারাজ নিজেও একেবারে কম যান না। এখন সমস্ত মন্ত্রি-সভা একমত হয়ে আমার বিরুদ্ধে রাজ-দ্রোহের অভিযোগ এনেছে এবং বিশ্বাসঘাতক হিসেবে প্রাণদণ্ড দেবার চেষ্টায় আছে। আমি তাঁর কথায় সন্দেহ করতে পারি ভেবে তিনি সেই অভিযোগের একটি নকলও আমাকে দেখালেন।

তারপর আবার বললেন, অনেক কথা কাটাকাটির পর অবশ্য ঠিক হয়েছে যে একেবারে প্রাণে না মেরে আমার চোখ দুটিকে শুধু অন্ধ করে দেওয়া হবে। তাতে একদিকে মহারাজের দয়া দেখানোও হবে অন্যদিকে কানা হয়ে বেঁচে থাকলেও আমার দ্বারা রাজ্যের কোনো অনিষ্ট হতে পারবে না। মহারাজের বিশজন ডাক্তার ছুরি শানিয়েই রয়েছেন। তিন দিনের মধ্যেই দরবারের এ আদেশ নিয়ে তাঁরা আমার কাছে আসবেন এবং চোখ দুটি গেলে দিয়ে যাবেন। শুনে আমি যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়লাম।

ভোর হতে না হতেই মন ঠিক করে ফেললাম। এ আদেশ আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। কিন্তু চোরের মত পালিয়ে যাবো? সে চিন্তাও অসহ্য। সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজের সেক্রেটারীর কাছে একখানা চিঠি লিখলাম, তারপর পোঁটলা-পুটলি নিয়ে একেবারে খাড়ির ধারে এসে হাজির হলাম। এদেশের কয়েকটি যুদ্ধজাহাজ সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদেরই একটিতে মালপত্র রেখে সেটিকে টানতে টানতে জলের ভেতর দিয়ে কখনো সাঁতরে একসময় ব্লেফুসকো দ্বীপে এসে পৌঁছলাম। দুটি লোকের কাছে পথ জেনে নিয়ে রাজধানীতে আসতে খুব বেশীক্ষণ লাগলো না। খবর পেয়েই রাজা মশাই ঘোড়ায় চড়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। পেছনে গাড়ীর মধ্যে রানী ও তাঁর দাস-দাসীরাও ছিলেন। আমাকে দেখেই রাজা মশায় ঘোড়া থেকে নেমে আমার দিকে হাত বাড়ালেন। কারো মুখেই ভয় বা বিরক্তির কোনো চিহ্ন দেখতে পেলাম না। খুব সহৃদয় ভাবে তাঁরা আমাকে গ্রহণ করলেন। এখানে তাঁর প্রাসাদ বা

দরবার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি জানিয়ে আমি পাঠকদের বিরক্তি ঘটাতে চাই না। মোটের উপর লিলিপুটের মত এ রাজবাড়ীও খুব সুন্দর ও সাজানো। তবে অসুবিধের মধ্যে এখানে ওখানকার মত থাকার জায়গা জুটলো না। খোলা মাটিতেই পড়ে থাকতে হলো। উপায় কি ?

দু'দিন কষ্টেসৃষ্টে কাটলো। নতুন জায়গা। বিশেষ কিছুই চিনি না। খাড়ির ধারে বন্দরের কাছটিতেই ঘুরতাম। তিন দিনের দিন খাড়ির পাড়ে পাড়ে অনেক দূর এগিয়ে গেলাম। হঠাৎ তীর থেকে মাইল খানেক দূরে জলের উপর কি যেন একটা চোখে পড়লো। প্রথমটায় গা করিনি, তারপর ভালো করে দেখেই একেবারে লাফিয়ে উঠলাম। নিশ্চয়ই উল্টে-যাওয়া কোনো নৌকো। হুর্‌রে্‌ বলে তৎক্ষণাৎ জলে নেমে পড়লাম। জোয়ারের ঠেলায় জিনিসটাও আমার দিকেই আসছিল। সিকি মাইলের মত গিয়ে সেটাকে ধরে ফেললাম। হ্যাঁ, নৌকোই বটে। কোন ইউরোপীয় জাহাজের লাইফ-বোট হয়ত ঝড়ের মুখে জাহাজ থেকে ছিটকে পড়েছে। খুশিতে আমি যেন পাগলের মত হয়ে গেলাম। ভগবান বোধ হয় এতদিনে মুখ তুলে চাইলেন। এই নৌকোখানা নিয়েই হয়ত এই নির্বাসনের দেশ ছেড়ে আবার নিজের জন্মভূমিতে ফিরে যেতে পারবো।

অনেক কষ্টে সেটিকে নিয়ে বন্দরে ফিরে এলাম। অল্প দিনের মধ্যেই সেটিকে সারিয়ে নিলাম। বৈঠা, পাল খাটানোর মাস্তুল, পালের কাপড়-চোপড়, দড়ি সব কিছুই রাজা মশায়ের দয়ায় যোগাড় হয়ে গেল। এত বড় একখানা গন্ধমাদন নৌকো সে দেশের লোক জীবনে কখনো দেখেনি। তার উপর এই সব কাণ্ডকারখানা দেখে হাজার হাজার মানুষ সেখানে অষ্টপ্রহর ভিড় করতে লাগলো। এবার ফুটো-ফাটা বোঁজানোর জন্য নৌকোখানায় চর্বি মাখানো হতে লাগলো। প্রায় চারশো ভেড়ার চর্বি দরকার হলো। তাও

রাজা মশায়ই দিলেন। গোছানো-গাছানো সব ঠিকঠাক। এবার রওনা হলেই হয়। কিন্তু তুর্ভাগ্য আমার সঙ্গের সাথী। যাত্রার মুখে আবার থমকে দাঁড়াতে হলো। লিলিপুটের রাজার চিঠি নিয়ে তাঁর এক দূত ব্লেফুসকোতে এসে হাজির হলো। লিলিপুটের নালিশ যে আমি রাজদ্রোহী। বিচার এড়ানোর মতলবে আমি ব্লেফুসকোতে এসে পালিয়েছি। রাজা মশাই যেন পত্রপাঠ আমাকে ধরে লিলিপুটে ফেরৎ পাঠিয়ে দেন।

কিন্তু কেন জানি না ব্লেফুসকোর রাজা আমাকে খুব ভালো চোখে দেখেছিলেন। তিনি নানা রকম ওজর-আপত্তি দেখিয়ে লিলিপুটের সম্রাটকে চিঠির পর চিঠি পাঠাতে লাগলেন, আর সেই সুযোগে আমার চুপচাপ সরে পড়ার জন্য পথ করে দিলেন। আমি তো এক পায়ে খাড়া! এবার রাজার হুকুমে একশোটা ষাঁড়ের ছাল-ছাড়ানো ধড়, সেই পরিমাণ রুটি, রাঁধা মাংস ও খাবার জল আমার নৌকোয় তুলে দেওয়া হলো। তাঁর ইচ্ছা, এ দেশের কিছু জীবজন্তু আমি দেশে নিয়ে যাই। কাজেই গোটা কয়েক গরু, তুটো ষাঁড় আর কিছু ভেড়া-ভেড়ীও নৌকোয় তুলতে হলো। তাদের খাবার মত খড় ও কাঁচা ঘাসও বাদ গেল না। ও দেশের তু-একটি লোকজন নমুনা হিসেবে আমার দেশে নিয়ে যাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু রাজা মশাই কিছুতেই রাজী হলেন না। এমন কি তাঁর সামনে আমাকে শপথ করতে হলো যে, কারো ইচ্ছে থাকলেও আমি তাকে এভাবে নিয়ে যাবো না।

যাহোক, মন আনন্দে উড়ু-উড়ু, এবার আমি প্রস্তুত। রাজা মশাই দলবল নিয়ে খাড়ির পারে আমাকে বিদায় দিলেন। আমি উপুড় হয়ে শুয়ে প্রত্যেকের হাতে চুমো খেলাম। রাজা মশাই আমাকে পঞ্চাশটি থলি উপহার দিলেন। তাদের প্রত্যেকটার ভেতর ছিল তুশো করে সোনার মোহর। স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তাঁর ও রানীমার এক সাথে দাঁড়ানো অবস্থায় আঁকা

একখানা খুব দামী ছবিও পেলাম। অত্যন্ত যত্ন করে সেটি আমার হাতের দস্তানার মধ্যে রেখে দিলাম। তারপর ধীরে ধীরে নৌকোয় গিয়ে উঠলাম।

সে দিনটি ছিল ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর। সকাল ছ'টা। হিসেব করে দেখলাম আজ থেকে ঠিক এক মাস আগে আমি এ দ্বীপে পা দিয়েছিলাম।

পালে হাওয়া লেগে তরতর করে নৌকো এগিয়ে চললো। রাতের মত নোঙর ফেলে অনেক দূরে সমুদ্রের জন-মনিষ্যিহীন একটি ছোট্ট দ্বীপে রাত কাটালাম। পরদিনও নাও ছেড়ে সারাটা দিনরাত ঐভাবেই কাটলো। কেবল জল জল আর জল। আর কিছুই চোখে পড়লো না। তার পরদিনও সকাল গড়িয়ে দুপুর নামলো। একভাবেই ভেসে চলেছি। হঠাৎ অনেক দূরে জাহাজের পালের মত কি যেন একটা নজরে পড়লো। চোখের ভুল? না, না, অবিকল জাহাজের পাল বলেই তো মনে হয়। প্রাণপণে দাঁড় বাইছি। অনেকক্ষণ পর জিনিসটা স্পষ্ট হলো। সত্যি সত্যি একটা জাহাজ। উন্মাদের মত আমি তখন আমার জামার কাপড় উড়িয়ে নিশান দিচ্ছি। তারপর কখন জাহাজ থেকে একটি তোপ দাগলো, তরতর করে একটি নিশান তার মাস্তুলের ডগায় উঠে এলো, এগিয়ে এসে জাহাজটা আমাকে তার উপর তুলে নিলো, আনন্দের চোটে যেন ভালো করে মনেই পড়ে না। শুধু মনে আছে সেটি একটি বিলিতি জাহাজ, জাপান থেকে দেশে ফিরে যাচ্ছিল। ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল ঐ জাহাজেই আমি দেশে ফিরে এলাম।

জাহাজে থাকার সময় এমন একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল যা না বলে এ কাহিনী শেষ করা যায় না। ব্লেফুসকো থেকে নিয়ে আসা আমার একটি ভেড়া জাহাজের ইঁদুরে খেয়ে শেষ করে ফেলেছিল।

দ্বিতীয় খণ্ড

(দৈত্যপুরীতে)

এক

বাইরে বেরোলে ঘরের জন্য মন কাঁদে আর ঘরে ফিরলে বাইরের জন্য ছটফটিয়ে উঠি। আমার মাথায় বোধ হয় একটা চরকি-কল আছে, যা কেবলই ঘুরপাক খেতে থাকে। নইলে ছ'মাসও হয়নি দেশে ফিরেছি এরই মধ্যে আবার সমুদ্রের জন্য মন উশখুশ করবে কেন?

ব্লেফুসকো থেকে যে জীবজন্তুগুলো এনেছিলাম, এখানে ওখানে তাদের দেখিয়ে এর মধ্যে বেশ দুপয়সা রোজগারও হয়েছিল। তারপর কি ভেবে এক ভদ্রলোকের কাছে সেগুলো ছ'শো পাউণ্ডে বেচে দিলাম। এপিং-এ আমার এক জেঠামশায়ের কিছু সম্পত্তি ছিল। তাও আমার হাতে এসে গেল। আবার চলে যাবো শুনে বউ কান্নাকাটি করছিল। লক্ষ্মী-সোনা বলে অনেক বুঝিয়ে শুঝিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া ও সংসারখরচ বাবদ তার হাতে নগদ পনেরো শো পাউণ্ড গুনে দিলাম। সম্পত্তিটুকুও তার নামে লিখে দিলাম। তারপর রেড-রিফ্ শহরে পছন্দসই একটি বাড়ী কিনে, সবাইকে সেখানে রেখে একদম ঝাড়া হাত-পা হয়ে বসলাম।

এবার বেরিয়ে পড়লেই হয়। সুযোগের অভাব আমার কোনদিনই হয় না। এবারও হলো না। তিনশো টনের একটি জাহাজ নাম অ্যাডভেঞ্চার, লিভারপুল থেকে ভারতবর্ষের সুরাট বন্দরের দিকে যাবার জন্য তৈরী। কাপ্তেন আমার বিশেষ জানাশোনা। সেখানেই চাকরি হয়ে গেল।

১৭০২ সাল। ২০শে জুন সকালে আমাদের জাহাজ ছাড়লো। সুন্দর বাতাস, ঠাণ্ডা নীল সমুদ্র। ভালোয় ভালোয়ই উত্তমাশা

অন্তরীপে পাড়ি দিলাম। খাবার জল নেবার জন্য জাহাজ এখানে দু'একদিন থাকবে।

জাহাজের তলায় একটি ছোট্ট ফুটো দিয়ে জল উঠছিল বলে মেরামতের জন্য মালপত্র সব নামিয়ে পুরো শীতকালটাই সেখানে বসে থাকতে হলো। মার্চের আগে আর ওখান থেকে বেরোনো গেল না।

মাদাগাস্কার প্রণালীও ভালোয়-ভালোয়ই পার হলাম। কিন্তু দ্বীপের উত্তর মাথায় আসতে না আসতেই আবার সেই ঝড়ের দাপাদাপি শুরু হয়ে গেল। প্রায় কুড়ি দিন নাকানি-চুবানি খেয়ে মালাক্কা দ্বীপ ছাড়িয়ে বিষুব রেখার ওপারে গিয়ে পৌঁছলাম।

ঝড় থামলো, কিন্তু কেমন একটা থমথমে ভাব রয়েই গেল। ক্যাপ্টেন নিকোলাস পাকা নাবিক। তিনি বললেন, শীগগীরই এর চেয়েও বড় আর একটা ঝড়ের মুখে আমাদের পড়তে হবে।

ঠিক তাই-ই হলো।

দু'একদিনের মধ্যেই দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে জোরে মৌশুমি বাতাস ছুটে এলো। উত্তর-পূব দিকে তাড়া খেয়ে হু-হু করে কোথায় যে আমরা ভেসে যেতে লাগলাম, বুঝতেই পারলাম না। জাহাজটি খুব পাকা-পোক্ত বলেই রক্ষা! খাবার-দাবারেও কিছু টান পড়েনি, কিন্তু খাবার জল ক্রমেই ফুরিয়ে আসছিল।

ঝড়ের বেগ একটু কমতেই ক্যাপ্টেন সোজা উত্তর-মুখে পাড়ি ধরলেন। তাঁর আশা এই ভাবে চীনদেশের কূল ঘেঁষে তিনি মরু সাগরে যেয়ে পৌঁছতে পারবেন।

১৭০৩ সালের ১৬ই জুন কূল দেখা গেল। পরদিন একটি মস্তবড় দ্বীপের ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠলো। সেটি সত্যই দ্বীপ না কোনো মহাদেশ, তখনো বুঝতে পারিনি। দ্বীপের একটি দিক লম্বা হয়ে সমুদ্রের মধ্যে এসে ঢুকেছিল। তার পাশ দিয়েই

খাড়ি। কিন্তু জাহাজ ঢোকার মত চওড়া বা গভীর নয় বলে তা থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে আমরা নোঙর করলাম।

সঙ্গে সঙ্গেই জলের খোঁজে দশ-বারো জন নাবিক বোট নিয়ে নেমে পড়লো। আমিও ওদের সঙ্গে গেলাম। দেশটি ঘুরে ফিরে দেখবো, এই আমার ইচ্ছে। কিন্তু না, নদী-নালা দূরে থাক্, এদেশে যে কোনো মানুষের বসবাস আছে, তাও মনে হলো না। লোকগুলো তবু হাল ছেড়ে দিলো না। তীরের কাছাকাছি জলের জন্য আরও কিছু খোঁজাখুঁজি করতে লাগলো।

এদিকে আমি দল ছেড়ে দ্বীপের ভেতর মাইলখানেক এগিয়ে গিয়েছি। কিন্তু পাহাড় আর জংলা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না। 'ধুত্তোর' বলে ফিরে যাওয়াই ঠিক করলাম। খালের পাশ দিয়ে হনহনিয়ে হাঁটছি। সমুদ্রের প্রায় কাছে এসে পড়েছি, হঠাৎ দেখি আমার সঙ্গীরা পাগলের মত দৌড়ে এসে নৌকোয় উঠে মরি-বাঁচি করে দাঁড় বেয়ে জাহাজের দিকে ছুটে পালাচ্ছে, আর দৈত্যের মত প্রকাণ্ড একটা মানুষ লম্বা পায়ে খপর-খপর করতে করতে তাদের পিছু পিছু তাড়া করে যাচ্ছে। প্রায় ধরে ফেলে আর কি! জল সেখানে অনেক গভীর, কিন্তু আশ্চর্য, দৈত্যটার হাঁটুর বেশী ডোবেনি। ভাগ্য ভালো সঙ্গীরাও বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিল; তা ছাড়া জলের তলায় সেখানে বোধ হয় খোঁচা খোঁচা পাথরের ডগা মুখ উঁচিয়ে ছিল, দৈত্যটা আর এগোতে পারলো না। ওখানে দাঁড়িয়েই শূন্যে ঘুষি বাগাতে লাগলো।

তিলমাত্র দেরী না করে আমিও প্রাণভয়ে উল্টো দিকে ছুটলাম। দৌড়তে দৌড়তে এক পাহাড়ের উপর গিয়ে উঠলাম। সেখান থেকে অনেক দূর দেখা যায়। সমুদ্রের দিকটা শুকনো আর জংলা হলেও পাহাড়ের পেছন দিকটা একেবারে অন্য রকম। সুন্দর চষা জমি, ফুল-ফল আর সবুজ গাছপাতায় ভরতি। দেখলে চোখ জুড়োয়, কিন্তু কি পেল্লায় তাদের চেহারা। ফসল কাটার পর মাঠে

যে শুকনো গোড়াগুলো পড়ে আছে তারাও প্রায় কুড়িফুট লম্বা। দেখে শুনে আমার তো ভিরমি লাগার মত অবস্থা। নীচেই একটি বার্লিক্ষেত। তার মাঝখানের আলটি লণ্ডনের যে কোনো বড় সড়কের চেয়ে চওড়া। নেমে এসে সেখানে দাঁড়াতেই আমার আক্কেল গুড়ুম। দুধারের প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু বার্লির চারাগুলো আমাকে যেন একেবারে গিলে ফেললো। প্রায় ঘণ্টাখানেক সেখানে লুকিয়ে থাকার পর হাঁটতে হাঁটতে ক্ষেতের ধারে এসে পড়লাম। সেখানে একটি বুনো ঝোপের বেড়া। বেড়া তো নয়, যেন আকাশ-ছোঁয়া একটি দেয়াল। উঁচুতে একশো কুড়ি ফুটের কম নয়। ওপারে গাছ-গাছালির বাগান। সেগুলো যে কত উঁচু হিসেব করলে মাথা ঘুরে যায়। পাশের ক্ষেতে যাওয়ার জন্য বেড়ার ফাঁকে ছোট্ট একটি সিঁড়ি। এ পাশে ওপাশে আটটি মোটে ধাপ। কিন্তু তা ডিঙানো আমার কর্ম নয়। একটি থেকে আরেকটি ধাপ ছয় ফুট উঁচুতে।

এ আমি কোথায় এসে পড়লাম? কোনো ফাঁক-ফোকর দিয়ে গলে বেরিয়ে যাবার ফিকির খুঁজছি, হঠাৎ দেখি, ওরে বাবা, নৌকোর পেছনে তাড়া করে যাওয়া সেই দৈত্যটার মতই আর একটা মানুষ জোর পায়ে বেড়ার দিকে এগিয়ে আসছে। মাথাটা তার গির্জার চূড়োর মত লম্বা। এক এক ধাপে দশ-দশ গজ পার হয়ে যাচ্ছে। ভয়ে যেন দমবন্ধ হয়ে এলো। এখন উপায়? এক দৌড়ে আবার ক্ষেতের মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম।

লোকটা সিঁড়ির উপরের ধাপে উঠে কাদের যেন ডাকলো। উঃ বাজ পড়ার মত সে কি কান-ফাটানো আওয়াজ! একটু পরেই ওর মত আরো সাত সাতটা দানব ফসল-কাটা হেঁসো হাতে ছুটে এলো। কাস্তেগুলোই কি একটু আধটু? এক একখানা আমাদের দেশের প্রায় ছ'সাতখানার সমান। গায়ের জামা-কাপড় দেখে মনে হয় নতুন লোকগুলো আগের লোকটার

চাকর-বাকর। এসেই ক্ষেতে নেমে ঘস্‌-ঘস্‌ করে ফসল কাটতে শুরু করলো। ওরা যত এগোয়, আমিও তত পিছু হটি। কিন্তু কতক্ষণ? লোকগুলো ক্রমেই কাছে আসছে। পালাতে পালাতে আমিও এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি যেখানে বর্ষা-ভেজা ফসলগুলো হাওয়ার ভারে একেবারে শুয়ে পড়েছে। এতক্ষণ তবু চারাগাছের আঁড়াল দিয়ে লুকিয়ে চলাফেরা করা যাচ্ছিল। এখন? শোয়া গাছগুলোর বড় বড় ধারালো পাতায় আর গোছা-গোছা শীষে এমন ভাবে জট পাকানো যে ওর তলায় গিয়ে ঢোকাও অসম্ভব। কি করা যায় ভাবছি, হঠাৎ দেখি ওরা একেবারে আমার পেছনে এসে পড়েছে।

একে না-খাওয়া, না-দাওয়া, তার উপর পরিশ্রম আর ধুকপুকুনি। যা আছে কপালে তাই হোক, বলে আমি একেবারে নেতিয়ে পড়লাম। এর চেয়ে মরে যাওয়াও ঢের ভালো। দেশে, বউ ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়লো। কেন তাদের মানা না মেনে মরতে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলাম। মনে পড়লো লিলিপুটের কথা। সেখানেই বা আমি কি ছিলাম, আর এখানেই বা কি! সেখানে আমিই ওদের চোখে দৈত্য। আমার চুলের ডগাটি ছোঁবে এমন সাহস কার? একটা গোটা নৌ-বহর আমি কড়ে আঙুলে টেনে নিয়ে এসেছি। এমন অনেক কিছু করেছি যা ওরা চিরকাল মনে রাখবে, যেগুলো রূপকথার মত লোকের মুখে মুখে ঘুরবে। আর এখানে? আমার কাছে লিলিপুটের একটি মানুষ যা, তার চেয়েও নগণ্য। এই দানবগুলো হয়তো গরিলার মতই রাগী ও হিংস্র। প্রথম যার হাতে পড়বো সেই হয়ত আলগোছে মুখে ফেলে দিয়ে কোঁৎ করে গিলে ফেলবে। নয় তো একটি আছাড়েই ভবলীলা শেষ করে দেবে।

পৃথিবী কি আশ্চর্য; কত রকমের প্রাণী যে এখানে আছে। আমরা যাদের পিঁপড়ের চেয়েও ছোট দেখছি, কোথাও কারো কাছে

তারাই হয়ত আবার দৈত্যের মত, না হয় আমরাই পিঁপড়ের মত। এত বড় ভূগোলের আমরা কতটুকুই বা জানি?

ভাবতে ভাবতে কোথায় যেন তলিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ বিকট শব্দে কঁকিয়ে উঠলাম। ওরা একেবারে গায়ের উপর এসে পড়েছে। আর একটু হলেই পায়ের তলে চাপা পড়ে ছাতু হয়ে যেতাম, হয়তো হেঁসোর এক টানে কুচ্ করে দুখানা হয়ে পড়ে থাকতাম।

লোকগুলো থমকে দু'পা পিছিয়ে গেল। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে অনেকক্ষণ খুঁজে খুঁজে আমাকে দেখতে পেল। আমি তখন ভয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছি। প্রথমেই ওরা আমার গায়ে হাত দিলো না। কি জানি ছোটখাটো বিছা বা বিষাক্ত পোকা-মাকড় যদি হই! পরে অনেক ভেবে চিন্তে একজন দু আঙুলে আমাকে ধরে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ওর আঙুলের চাপে আমার পিঠ গুঁড়ো হয়ে যাবার যোগাড়। তবু ছটফট না করে চুপ করেই রইলাম। কারণ মাটি থেকে আমি তখন ষাট ফুট উপরে ঝুলছি। কোন রকমে যদি হাত ফস্কে একবার পড়ি বা ও-ই আমাকে ঘেন্নায় ছুঁড়ে ফেলে দেয় তো একেবারে আলুর দম হয়ে যাবো।

কিন্তু ভাগ্য ভালো, লোকটা আমার রকম-সকম দেখে যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হলো। খুবই অদ্ভুত কোনো জিনিসের মত চোখের গোড়ায় নিয়ে বার বার আমাকে নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগলো। মিনমিনে গলায় বলা আমার কথাগুলোও যেন বেশ কান পেতে শুনলো। কিন্তু বুঝবে কি করে?

ব্যথায় আমি ততক্ষণে গোঙাতে শুরু করেছি। এপাশে ওপাশে ঘাড় ঝাঁকিয়ে কোনমতে সে কথা ওকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। কিছুটা যেন বুঝলোও। কারণ তখন-তখনি সে তার জামার আঁচলটা তুলে আলগোছে আমাকে তার উপর নামিয়ে রাখলো। তারপর এক ছুটে তার মনিবের সামনে এনে হাজির করলো। সব শুনে মনিব মশায় লাঠির মত মোটা একগাছা খড় দিয়ে আমার

গায়ের কোটটা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখতে লাগলেন। হয়তো পরখ করলেন সত্যি সত্যি ওটা কোট, না ছোট ছোট প্রাণী বা পোকা-মাকড়দের মত আমার গায়ের কোনো খোলস। মুখখানা ভালো করে দেখবার জন্য আমার চুলগুলোও তিনি ফুঁ দিয়ে মুখের উপর থেকে সরিয়ে দিলেন। তারপর আলগোছে উপুড় করে মাটির উপর ছেড়ে দিলেন। আমিও খাড়া হয়ে উঠে তাঁর সামনে দিয়ে হেঁটে বেড়াতে লাগলাম।

সবাই মিলে আমাকে ঘিরে গোল হয়ে বসলো। প্রথমেই আমি টুপি খুলে, নীচু হয়ে মনিব মশায়কে নমস্কার করলাম। তারপর পকেট থেকে এক থলি মোহর বের করে তাঁর সামনে রাখলাম। তিনি সেগুলো হাতের তেলোয় ঢেলে বেশ কিছুক্ষণ দেখলেন, একটা আলপিনের মাথা দিয়ে নেড়ে চেড়ে জিনিসগুলো কি বুঝতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু মাথা মুণ্ডু কিছুই হদিস করতে না পেরে থলিটি আবার আমাকেই ফিরিয়ে দিলেন।

একটু পরেই চাকরগুলো চলে গেল। মনিব মশায় পকেটের রুমালখানা চার ভাঁজ করে মাটির উপর পাতলেন। তারপর হাতের বুড়ো আঙুলটি উল্‌টিয়ে আমাকে তার উপর উঠে আসতে ইশারা করলেন। আমার কোনো কষ্ট হলো না, কারণ ভাঁজকরা রুমাল-খানা বারো ইঞ্চির বেশী পুরু হয়নি। যদি পড়ে-টড়ে যাই এই ভয়ে রুমালের উপর উঠেই আমি সটান শুয়ে পড়লাম। উনিও আমাকে গলা অবধি মুড়ে হাতে নিয়ে বাড়ীর দিকে চললেন।

'ওগো দেখে যাও, দেখে যাও'—চেঁচামেচিতে গিন্নী ছুটে এলেন, কিন্তু আমাকে দেখা মাত্রই এমন এক বেসুরো চীৎকার দিয়ে ছুটে পালালেন যে মনে হলো তিনি যেন অদ্ভুত একটা ব্যাঙাচি বা সাপের ছানা দেখেছেন। কর্তার কাছে সব শুনে টুনে শেষে সে ভাব অবশ্য কেটে গেল। আমার হাব-ভাব ও মানুষের মত চেহারাটা দেখে আমার উপর যেন একটু নেক নজরও পড়লো।

তারাই হয়ত আবার দৈত্যের মত, না হয় আমরাই পিঁপড়ের মত। এত বড় ভূগোলের আমরা কতটুকুই বা জানি ?

ভাবতে ভাবতে কোথায় যেন তলিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ বিকট শব্দে কঁকিয়ে উঠলাম। ওরা এক্কেবারে গায়ের উপর এসে পড়েছে। আর একটু হলেই পায়ের তলে চাপা পড়ে ছাতু হয়ে যেতাম, হয়তো হেঁসোর এক টানে কুচ্ করে দুখানা হয়ে পড়ে থাকতাম।

লোকগুলো থমকে দু'পা পিছিয়ে গেল। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে অনেকক্ষণ খুঁজে খুঁজে আমাকে দেখতে পেল। আমি তখন ভয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছি। প্রথমেই ওরা আমার গায়ে হাত দিলো না। কি জানি ছোটখাটো বিছা বা বিষাক্ত পোকা-মাকড় যদি হই! পরে অনেক ভেবে চিন্তে একজন দু আঙুলে আমাকে ধরে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ওর আঙুলের চাপে আমার পিঠ গুঁড়ো হয়ে যাবার যোগাড়। তবু ছটফট না করে চুপ করেই রইলাম। কারণ মাটি থেকে আমি তখন ষাট ফুট উপরে ঝুলছি। কোন রকমে যদি হাত ফস্কে একবার পড়ি বা ও-ই আমাকে ঘেন্নায় ছুঁড়ে ফেলে দেয় তো এক্কেবারে আলুর দম হয়ে যাবো।

কিন্তু ভাগ্য ভালো, লোকটা আমার রকম-সকম দেখে যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হলো। খুবই অদ্ভুত কোনো জিনিসের মত চোখের গোড়ায় নিয়ে বার বার আমাকে নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগলো। মিনমিনে গলায় বলা আমার কথাগুলোও যেন বেশ কান পেতে শুনলো। কিন্তু বুঝবে কি করে ?

ব্যথায় আমি ততক্ষণে গোঙাতে শুরু করেছি। এপাশে ওপাশে ঘাড় ঝাঁকিয়ে কোনমতে সে কথা ওকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। কিছুটা যেন বুঝলোও। কারণ তখন-তখনি সে তার জামার আঁচলটা তুলে আলগোছে আমাকে তার উপর নামিয়ে রাখলো। তারপর এক ছুটে তার মনিবের সামনে এনে হাজির করলো। সব শুনে মনিব মশায় লাঠির মত মোটা একগাছা খড় দিয়ে আমার

গায়ের কোটটা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখতে লাগলেন। হয়তো পরখ করলেন সত্যি সত্যি ওটা কোট, না ছোট ছোট প্রাণী বা পোকা-মাকড়দের মত আমার গায়ের কোনো খোলস। মুখখানা ভালো করে দেখবার জন্য আমার চুলগুলোও তিনি ফুঁ দিয়ে মুখের উপর থেকে সরিয়ে দিলেন। তারপর আলগোছে উপুড় করে মাটির উপর ছেড়ে দিলেন। আমিও খাড়া হয়ে উঠে তাঁর সামনে দিয়ে হেঁটে বেড়াতে লাগলাম।

সবাই মিলে আমাকে ঘিরে গোল হয়ে বসলো। প্রথমেই আমি টুপি খুলে, নীচু হয়ে মনিব মশায়কে নমস্কার করলাম। তারপর পকেট থেকে এক থলি মোহর বের করে তাঁর সামনে রাখলাম। তিনি সেগুলো হাতের তেলোয় ঢেলে বেশ কিছুক্ষণ দেখলেন, একটা আলপিনের মাথা দিয়ে নেড়ে চেড়ে জিনিসগুলো কি বুঝতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু মাথা মুণ্ডু কিছুই হদিস করতে না পেরে থলিটি আবার আমাকেই ফিরিয়ে দিলেন।

একটু পরেই চাকরগুলো চলে গেল। মনিব মশায় পকেটের রুমালখানা চার ভাঁজ করে মাটির উপর পাতলেন। তারপর হাতের বুড়ো আঙুলটি উল্‌টিয়ে আমাকে তার উপর উঠে আসতে ইশারা করলেন। আমার কোনো কষ্ট হলো না, কারণ ভাঁজকরা রুমাল-খানা বারো ইঞ্চির বেশী পুরু হয়নি। যদি পড়ে-টড়ে যাই এই ভয়ে রুমালের উপর উঠেই আমি সটান শুয়ে পড়লাম। উনিও আমাকে গলা অবধি মুড়ে হাতে নিয়ে বাড়ীর দিকে চললেন।

'ওগো দেখে যাও, দেখে যাও'—চেঁচামেচিতে গিন্নী ছুটে এলেন, কিন্তু আমাকে দেখা মাত্রই এমন এক বেসুরো চীৎকার দিয়ে ছুটে পালালেন যে মনে হলো তিনি যেন অদ্ভুত একটা ব্যাঙাচি বা সাপের ছানা দেখেছেন। কর্তার কাছে সব শুনে টুনে শেষে সে ভাব অবশ্য কেটে গেল। আমার হাব-ভাব ও মানুষের মত চেহারাটা দেখে আমার উপর যেন একটু নেক নজরও পড়লো।

বেলা দুপুর। খিদেয় পেটের ভেতর ছুঁচোয় ডন মারছিল। চাকর এসে খাবার দিয়ে গেল। খাবার মানে, মোটা রুটি আর ডিম মাংস সাধারণ চাষীর ঘরে যা হয়। কিন্তু ডিশখানা দেখেই আমার চোখ ছানা-বড়া। এধারে ওধারে প্রায় চব্বিশ ফুট চওড়া। খাবার টেবিলটি মেঝে থেকে প্রায় তিরিশ ফুট উঁচু। মনিব মশায়, তাঁর বউ, তিনটি ছেলেমেয়ে আর এক বুড়ী ঠাকুরমা চারধারে গোল হয়ে বসলেন। আমিও টেবিলের উপর গিন্নীর ধার ঘেঁষে জবুথবু হয়ে বসলাম। তিনি মাংসের টুকরো ছোট ছোট মটর দানার মত কুচিয়ে, রুটির গুড়োর সঙ্গে মেখে আর একটি প্লেটে করে আমার কাছে রাখলেন। পকেট থেকে নিজের কাঁটা-চামচে বের করে আমি আস্তে আস্তে তাই খেতে লাগলাম। একটি ছোট্ট কাপ-এ মদও এলো। ছোট্ট মানে, কাপটিতে প্রায় দু'গ্যালন মদ ধরে। অতি কষ্টে সেটিকে তুলে ধরে যতটুকু পারলাম খেলাম। তারপর ইংরেজীতে ধন্যবাদ জানিয়ে পাত্রটি রেখে দিলাম। আমার ভাষা শুনে ওরা এমন জোরে হেসে উঠলো যে আমার কানে একেবারে তালা লেগে গেল।

এবার মনিব মশায় আমাকে কাছে ডাকলেন। টেবিলের উপর রুটির টুকরো-টাকরা ছড়িয়ে ছিল। দু-এক পা এগোতেই তাদের একটিতে হোঁচট খেয়ে দড়াম করে এক আছাড় খেলাম। ভাবলাম হাড়-গোড় বুঝি আর আস্ত নেই। .কিন্তু বিশেষ কিছু হয়নি। উঠে দাঁড়িয়ে আবার এগোচ্ছি, হঠাৎ মনিব মশায়ের বাচ্চা ছেলেটা,—বছর দশেক বয়স—খপ্ করে পা দুখানা ধরে এমন করে আমায় শূন্যে নাচাতে লাগলো যে ভয়ে আমি ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলাম। মনিব মশায়ও সঙ্গে সঙ্গে একটানে ওর হাত থেকে আমায় কেড়ে নিয়ে ছেলেটার বাঁ কানে এমন একখানা রাম-ঘুষি চালিয়ে দিলেন যা খেলে আমাদের দেশের এক দঙ্গল তাগড়া ঘোড়া এক সঙ্গে চিৎপটাং হয়ে যেতো। ওকে টেবিল থেকে উঠিয়েও দেওয়া হলো।

কিন্তু এই সব বজ্জাত ছেলের দুষ্টু বুদ্ধি আমি ভালো করে

জানতাম। সুবিধে পেলেই ছোট ছোট চড়ুই পাখি, ইঁদুর, বেড়াল বা কুকুরছানাদের নিয়ে ওরা যা করে তা ভেবে আমার ভয় আরো বেড়ে গেল। মার খেয়ে ছেলেটা তো রেগেই রইলো। ফাঁক পেলেই আমাকে সে ছেড়ে কথা কইবে না। মনিবের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ওর জন্য মাপ চেয়ে নিলাম। কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে ওকে একটু আদরও করলাম। যেন বলতে চাইলাম—মনে কিছু করো না ভাই।

গিন্নীর আদুরে বেড়ালটি তাঁর কোলেই বসে ছিল। গায়ে গতরে সেটা প্রায় তিনটে ষাঁড়ের মত। আর তেমনি ভাঁটার মত দুটো চোখ আর ইয়া-বড়-বড় গোঁফ। প্রথম থেকেই ওটাকে দেখে ভয় পাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা বিশ্রী রকমের ঘড়ঘড়ে আওয়াজ শুনে চমকে উঠলাম। এক ডজন তাঁতে মাকু ঠেলতে লাগলে যেমন আওয়াজ বেরোয়, শব্দটা প্রায় সে রকম। তাকিয়ে দেখি বেড়ালটাই ওরকম শব্দ করছে। গিন্নী যদিও ওকে খুব শক্ত করেই ধরে রেখেছিলেন, তবু ওর মুখের ভাব-সাব দেখে পঞ্চাশ গজ দূর থেকেও ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে গেল। কিন্তু যা ভেবেছিলাম তা নয়। জানোয়ারটা দেখতেই রাগী, আসলে খুবই শান্ত শিষ্ট। দেখলাম কয়েকবার আমাকে কাছে পেয়েও সে কিছু বললো না। বরং একবার ওর মুখের গোড়ায় এলেও ও-ই যেন ভয়ে জড়সড় হয়ে খানিকটা পিছিয়ে গেল।

গোটা কয়েক কুকুরও টেবিলের চার পাশে ঘুর-ঘুর করছিল। একটা 'মাস্টিফ' জাতের। আরগুলো গ্রে-হাউণ্ড। 'মাস্টিফ'টা প্রায় চার-চারটে হাতীর সমান। গ্রে-হাউণ্ডগুলো অতটা না হলেও লম্বায় 'মাস্টিফ'টার চেয়ে কিছু বড়। সেগুলোও বেশ ঠাণ্ডা। দেখে শুনে ক্রমে আমার সাহস ফিরে এলো।

খাওয়া দাওয়ার পর বাড়ীর ঝি বছরখানেকের একটি বাচ্চা কোলে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো। খোকনমণি বার কয়েক আমাকে দেখে

চোখ পিট পিট করলো। তারপর, বোধ হয় পুতুল ভেবেই, হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ধরবার জন্য বায়না করতে লাগলো। না পেয়ে কি তার কান্না! মনে হচ্ছিল ঘরখানা বুঝি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। ওকে ঠাণ্ডা করার জন্য গিন্নী আমাকে ওর কাছে নিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গেই ও খপ্‌ করে আমাকে তুলে নিয়ে মুণ্ডুটা মুখে পুরে দেবার জন্য হাঁ করলো। ভয়ে আমি এমন জোরে চেঁচিয়ে উঠলাম যে ও নিজেই ভয় পেয়ে ধপ্‌ করে আমাকে হাত থেকে ছেড়ে দিল। ভাগ্যিস মাটিতে পড়ার আগেই গিন্নী আমাকে ধরে ফেললেন, নইলে সেদিনই হাড়-গোড় ভেঙে আমি অক্কা পেতাম। একটু পরেই কর্তা কাজে বেরিয়ে গেলেন। পই-পই করে বলে গেলেন, আমাকে যেন খুব সাবধানে রাখা হয়।

ঘুমে আমার দুচোখ ভেঙে আসছিল। গিন্নী আমাকে তাঁর বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দিলেন। আমাদের দেশের যে কোনো বড় জাহাজের পালের মত মস্ত ও ভারী এক টুকরো রুমালের কোণা দিয়ে গলা অবধি ঢেকে, দোর বন্ধ করে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম যেন বউ আর ছেলে নিয়ে দেশের বাড়ীতে বসে গল্প করছি। জেগে উঠেই মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। দেখি, একলা ঘরে খাটের এক কোণায় পড়ে আছি। ঘরখানা দেখলে মাথা ঘুরে যায়। লম্বা-চওড়ায় দু'তিনশো ফুটের কম নয়। আর উঁচুও তেমনি। খাটখানাই বা কি পেল্লায়! পায়াগুলোই মেঝে থেকে আট গজ উঁচু। শুয়ে শুয়ে এসব দেখছিলাম, হঠাৎ মস্ত মস্ত দুটো ধাড়ী ইঁদুর কিচির-মিচির করতে করতে একেবারে বিছানায় এসে ঢুকলো। খানিকক্ষণ ছোঁক ছোঁক করে কি যেন শুঁকে শুঁকে বেড়ালো, তারপর খাটময় দাপাদাপি শুরু করে দিলো। আমি না পারি খাট থেকে নামতে, না কোথাও গিয়ে লুকোতে। এক সময় মরিয়া হয়ে লাফিয়ে উঠলাম। তলোয়ারখানা কোমরেই ছিল। একটানে খুলে হাতে নিলাম। জানোয়ার দুটোও কম

যায় না। এবার তারা হুদিক থেকে আমার গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ধারালো পা দিয়ে কোটের কলারটা ভীষণ ভাবে আঁচড়াতে লাগলো। গলাটাই বুঝি ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলে! থাকতে না পেয়ে তলোয়ারের এক খোঁচায় একটার পেট চিরে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই সেটা ধপ্ করে আমার পায়ের কাছে পড়ে খাবি খেতে লাগলো। আর একটা পালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই পিঠে এমন একখানা রাম-কোপ বসিয়ে দিলাম যে সারা বিছানায় রক্ত ছড়াতে ছড়াতে কোন মতে সেটা চম্পট দিলো।

বাঘা কুকুরের মত বড় এই রাক্ষুসে ইঁহুর হুটোর সাথে লড়াই করে আমার হাঁফ ধরে গিয়েছিল। ভাগ্যিস শুতে যাবার আগে কোমরবন্ধটা খুলে রাখিনি। তা হলে ওরা আমাকে নিশ্চয়ই টুকরো টুকরো করে ফেলতো। মরা ইঁহুরটার ল্যাজের দিকে চোখ পড়তেই আমি চমকে উঠলাম। মেপে দেখলাম, ওটা এক ইঞ্চি কম হু'গজ লম্বা অর্থাৎ প্রায় চার হাতের মত। ইঁহুরটাকে তুলে বাইরে ফেলে দিতে গা ঘিন-ঘিন করছিল। সেটা তখনো মরেনি দেখে আর এক কোপে এক্কেকারে শেষ করে দিলাম।

মনিব-গিন্নীও ঠিক সেই সময়েই ঘরে ঢুকলেন। আমার গা-ময়, বিছানাময় এত রক্ত দেখে বেচারী প্রায় মূর্ছা যাবার মত অবস্থা। একছুটে এসে হাত বাড়িয়ে আমাকে বুকে তুলে নিলেন। আমি মুচকি হেসে মরা ইঁহুরটা ওকে দেখালাম। আকারে ইংগিতে ব্যাপাটাও বুঝিয়ে দিলাম। আমার কোনো চোট লাগেনি দেখে তিনিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

ঝি এসে সাঁড়াশী দিয়ে ধরে ইঁহুরটাকে জানালা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিলো।

দুই

মনিব মশায়ের একটি মোটে মেয়ে। এমন লক্ষ্মী মেয়ে আর হয় না। ন'বছর মোটে বয়েস, কিন্তু এরই মধ্যে সেলাই-ফোঁড়াইতে যেমন ওস্তাদ, ঘরের কাজকর্মেও তেমনি পাকা গিন্নী। বাচ্চা ভাইটির দেখাশোনা, নাওয়ানো, খাওয়ানো, ধোয়ানো, মোছানো সব কিছু সে একা হাতে করে। আমাকে পেয়ে সে যেন লুফে নিলো। খোকনমণির দোলনাখানায় নিজের হাতে সে তুবেলা আমার বিছানা করে দিতো। ঘুমুলে দোলনাটি ধরে একটি উঁচু কুলুংগীতে তুলে রাখতো। তু'এক দিনের মধ্যে মিহি কাপড় দিয়ে সে আমার জন্য সাত-সাতখানা শার্ট বানিয়ে ফেললো। আমার জন্য তার খাটনির শেষ ছিল না। তবু এত কাজের পরও রোজ সন্ধ্যায় মাস্টারনী সেজে সে আমাকে ওদের ভাষা শেখাতে বসতো। ফলে অল্প দিনের মধ্যেই আমি অনেক কিছু শিখে ফেললাম। মেয়েটি লম্বায় আমার প্রায় আটগুণ, কিন্তু ওর মা বলতেন বয়স আন্দাজে ওর নাকি বাড় কম।

ঐ দৈত্যপুরীতে প্রাণটি নিয়ে যে আমি বেঁচে ছিলাম সে কেবল ঐ মেয়েটির জন্যই। এক মিনিটও সে আমায় চোখের আড় করতো না। কোন রকমেই আমার গায়ে আঁচড়টি লাগতে দিতো না। এমন নরম ও মিষ্টি স্বভাবের মেয়ের উপর কার না মায়া পড়ে?

আমার কথা ও-গাঁয়ের সবাই জেনে গিয়েছিল। সবাই বলাবলি করতো, এ বাড়ীর মনিব মশায় এমন একটি আজব জিনিস মাঠ থেকে কুড়িয়ে পেয়েছেন, যা এতটুকুন হলেও অবিকল মানুষের মতই দেখতে। মানুষের মতই সে তুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায়,

হাঁটে চলে, কথা বলে, এ দেশের ভাষাও কিছু জানে,এখানকার বড়লোকের ঘরের মেয়েদের চেয়েও তার গায়ের রঙ অনেক ফর্সা, শরীরের এমন সুন্দর গড়ন যে আহা-মরি না করে পারা যায় না। লোকে শুনতো আর ঝেঁটিয়ে আমাকে দেখতে আসতো।

কাছেই মনিব মশায়ের এক বন্ধুর বাড়ী। লোকটি নিজেও চাষী, সেও একদিন আমাকে দেখতে এলো। আমি তৈরী হয়েই ছিলাম। মেয়েটির শেখানো মতো, টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে 'আসুন, আসুন,—কেমন আছেন' বলে তার ভাষাতেই তার সঙ্গে কথা কইলাম। তারপর নীচু হয়ে নমস্কার করে তলোয়ার-খানা টুক্ করে খাপ থেকে খুলে আবার তার ভেতর ঢুকিয়ে দিলাম। দেখে শুনে লোকটা তো অবাক! চশমাজোড়া নাকে গলিয়ে আর একবার ভালো করে দেখতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওর গোল-গোল ইয়া-বড় চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে আমি আর হাসি চেপে রাখতে পারলাম না। মনে হচ্ছিল যেন ঘুরঘুটি আঁধার ঘরের পাশাপাশি দুটি জানালা দিয়ে একজোড়া পূর্ণিমার চাঁদ উঁকি মারছে। আমার হাসিতে বাড়ীর আর সকলেও হেসে উঠলো। লোকটা কিন্তু বেজায় চটে গেল। ভাবলো ওকে বুঝি আমি ঠাট্টা করেছি। লোকটার নাম করলে নাকি হাঁড়ি ফেটে যায়, এমন কেপ্পন। সেদিন সে চুপচাপ চলে গেল। কিন্তু যাবার সময় এমন একখানা চাউনি ছুঁড়ে দিয়ে গেল, যেন বলে গেল, দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা।

মনিব মশায়ের কানে রোজই সে ফুশ-মন্তর দিতে লাগলো, করছো কি? পুঁচকেটাকে এ ভাবে ঘরে পুষে রেখে লাভটা কি হচ্ছে শুনি? তার চেয়ে যাওনা হাটের দিন শহরে নিয়ে; বাইশ মাইল তো মোটে রাস্তা, যেতে আসতে দুঘণ্টার মামলা! লোকজনকে দেখাও-টেখাও। এমন মাল জীবনে কেউ দেখেনি। তারাও তাজ্জব হবে, তোমার পকেটেও দুটো পয়সা আসবে।

কথাটা মনের মত। কর্তা মশায় লুফে নিলেন। কিন্তু মেয়েটি কাঁদতে লাগলো। তার ভাবনা এত দূর যাওয়া আসার হয়রানীতে আর ঐ সব গেঁয়ো-গোঁয়ার হাটুরে ছোটলোকদের টেপাটেপি আর টানা-হ্যাঁচড়ানিতে আমি না মরে দলা পাকিয়ে যাই। তা ছাড়া ত্বটো পয়সার জন্য এভাবে হাটে বাজারে আমাকে দেখিয়ে নিয়ে বেড়ানো? ছিঃ ছিঃ আমিই বা কি মনে করবো? আমার ভাবসাব দেখে আমাকে সে বেশ বড় ঘরের লেখাপড়া-জানা মানুষ বলেই ধরে নিয়েছিল। লজ্জায় সে যেন এতটুকু হয়ে গেল।

তার বাপকেও সে ভালো করেই চিনতো। পয়সার জন্য সে না পারে এমন কাজ নেই। এই তো গত বছর, ও একটা ভেড়ার বাচ্ছা পুষেছিল। কত কষ্টে এতটুকুন থেকে এত বড়টা করে তুলে-ছিল। কি মায়াই না পড়েছিল বাচ্চাটার উপর। কিন্তু তারপর যেই ওটা জোয়ান হয়ে উঠলো, ওকে লুকিয়ে বাবা সেটা কশাইয়ের কাছে বিক্রি করে দিলো। ওর মনের দিকে একবারও চাইলো না।

এবারও ঠিক তাই। আসা মাত্রই জ্যান্ত পুতুলটির মত ও আমাকে লুফে নিয়েছিল। বাপ-মাও বলেছিল—নে এটা তোকেই দিলাম। খুব সাবধানে রাখিস। একে নিয়ে পুতুল খেল্, নাওয়া, খাওয়া, ঘুমপাড়া যা খুশি কর্। করছিলও তাই। আজ হঠাৎ আবার পয়সার লোভে পুতুলটি ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

যা হোক, মেয়ের কান্নাকাটিতে শেষ মেশ ঠিক হলো যে, শহরে যাবার সময় মেয়েটিও আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকবে।

আমার মন কিন্তু অতটা খারাপ হয়নি। বরং মনে হয়েছিল ভগবান যা করেন ভালোর জন্যই করেন। হয়তো আমার এখান থেকে মুক্তি পাওয়ার দিন ঘনিয়ে এসেছে এবং সেজন্যই এরকম ঘটলো। হাটে বাজারে এ ভাবে নিজেকে দেখিয়ে বেড়ানো নিশ্চয়ই লজ্জার। কিন্তু মনকে বোঝালাম যে আমার অবস্থায় পড়লে স্বয়ং ইংলণ্ডের রাজাকেও কি এ সব সহ্য করতে হতো না?

যাই হোক, হাটের দিন সকালে ঘোড়ার পিঠে চড়ে আমরা রওনা হলাম। সামনে মনিব মশায়, তাঁর পেছনে আর একটি জিনের উপর মেয়েটি, আর তার কোলে আমি। আমি অবশ্যি এক দরজা আর দুই জানালা-ওয়ালা একটা কাঠের বাক্সের মধ্যে ছিলাম। বাক্স বললে ভুল হবে, বারো ফুট লম্বা, দশ ফুট চওড়া একটি খাসা কেবিন। খুব সুন্দর এক ফালি নরম তোষকও ওর মধ্যে পাতা ছিল। কাজেই আরামেই ছিলাম। জিনিসটি কোলের উপর রেখে মেয়েটি খুব শক্ত করে ধরে ছিল। ঘোড়াটা যে খুব জোরে ছুটছিল তা নয়, তবু এক এক কদমে প্রায় চল্লিশ গজ লাফিয়ে যাচ্ছিল। ঝাঁকুনিতে এক এক সময় মনে হচ্ছিল যেন ঝড়ে-পড়া জাহাজের মতই ঢেউয়ের পাহাড় ভেঙে উঠছি নামছি।

আধঘণ্টার মধ্যেই আমরা শহরে এসে পড়লাম। সামনেই 'গ্রীন-ইগল্' সরাইখানা। সেখানেই আমার খেল্ দেখানো হবে। হাট তখন সবে জমে উঠেছে। চারদিকে ঢোল পিটিয়ে দেওয়া হলো। পিল-পিল করে লোক সরাইখানার দিকে আসতে লাগলো।

প্রায় তিনশো বর্গ ফুট একটি টেবিলের উপর আমাকে দাঁড় করানো হলো। মেয়েটিও পাশেই একটি নীচু টুলের উপর আমাকে পাহারা দিতে বসলো। ভিড় বাঁচাবার জন্য এক এক বারে তিরিশ জনের বেশী লোককে ঘরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছিল না। মেয়েটির কথামত প্রথমে আমি টেবিলের উপর এক চক্কর ঘুরে এলাম। তারপর সবাইকে নমস্কার করে, মেয়েটির শেখানো বুলিতে দু'চার কথা বললাম। তারপর আমার দেশের তলোয়ার চালানোর কায়দা-কৌশল কিছু দেখানোর পর মেয়েটি আমার হাতে এক টুকরো খড় তুলে দিলো। সেটি হাতের মুঠোয় বাগিয়ে ধরে ছেলেবেলায় শেখা বর্শা চালানোর বিদ্যেটি আর একবার জাহির করলাম।

পর পর বারো বার সেদিন খেলা দেখাতে হলো। পরিশ্রমে আমি তখন আধমরা। ভিড় তবু বাড়ছেই। দরজা ভেঙে পড়ে

আর কি! অনেক ধাক্কাধাক্কি করেও কিছু হলো না। অগত্যা খেলা বন্ধ করে দিতে হলো। মেয়েটি প্রাণপণে মানুষের ধুম-ধাড়াক্কা থেকে আমাকে আড়াল করে রেখেছিল, কিন্তু কোথা থেকে একটা বদমায়েশ ছোঁড়া গোটা একখানা কাঠবাদাম আমার মাথার দিকে ছুঁড়ে মারলো। বোঁ করে কানের পাশ দিয়ে ছুটে, ঠকাস্ করে সেটা দেয়ালে গিয়ে লাগলো। তাকিয়ে দেখি, ওরে বাবা, বাদাম তো নয়, ছোটখাটো একখানা পাথুরে তরমুজ। মাথায় লাগলেই হয়েছিল আর কি! তালগোল পাকিয়ে মিহিদানা হয়ে যেতো! মনিব মশায়ও তক্কে-তক্কে ছিলেন। ছুটে গিয়ে খপ্ করে বদমায়েশটার ঘাড়ে ধরে রাম-ধোলাই দিয়েছিলেন।

কয়েকদিন পর বাড়ী ফিরে এলাম। কিন্তু সেখানেও কি শান্তি ছিল! সামনের হাটবার আবার শহরে যেতে হবে। ভারী খারাপ লাগছিল। আবার সেই ঝাঁকুনি-দোলানি, সেই আট দশ ঘণ্টা এক নাগাড়ে টেবিলের উপর লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি। এবার তো মড়ার মতন হয়ে ফিরে এসেছি। সামনের বার কপালে কি আছে, কে জানে?

যা হোক, সে তো তবু সাতদিন পরে। তার আগে এখানেই না সাবাড় হয়ে যাই।

বাঘ রক্তের স্বাদ পেয়েছে। আমি মরি আর বাঁচি, তার পকেটে পয়সা এলেই হলো। কর্তামশায় তার লাভের কলটি এখানেও পুরো চালু রেখেছেন। আশে পাশের একশো মাইল থেকে স্রোতের মত লোক আসছে। এক এক বারে তাদের ত্রিশ-চল্লিশ জনকে মোটা ভাড়ায় বাড়ীতে এনে রাখছেন, আর খেলা দেখাচ্ছেন। ঘরভাড়া আর খেলা দেখা দুদিক দিয়ে পকেট ফেঁপে উঠছে, তবু তাঁর খাঁই মিটছে না। লোভ বেড়েই চলেছে। অনেক ভেবে চিন্তে এখন ঠিক করেছেন, এ সব অজ পাড়াগাঁয়ে আর নয়। আমাকে নিয়ে দেশের বড় বড় শহরগুলোতে গিয়ে দস্তুর মত 'কার্নিভাল' জমিয়ে তুলবেন।

যে কথা, সেই কাজ। ১৭০৩ সালের সতেরোই অগস্ট, মানে, আমার এখানে আসার ঠিক দুমাস পরে, সত্যি সত্যিই তিনি আমাকে নিয়ে রওনা হলেন। প্রথমেই রাজধানীর দিকে যাবেন, তারপর যেখানে হয় সেখানে। সে শহরটি দেশের একেবারে মাঝখানে, এখান থেকে প্রায় তিন হাজার মাইল দূরে।

মেয়েটি এবারও নাছোড়বান্দা। কিছুতেই আমার সঙ্গে না গিয়ে ছাড়লো না, কিন্তু পাল্লাটা তো কম নয়। সেবার আধঘণ্টার ধকলেই আমার অবস্থা কাহিল হয়েছিল। তাই এবার সে আমার বাক্সের দেয়ালগুলো পর্যন্ত তুলোর গদীতে মুড়ে দিল। নীচেও আর একটা নতুন গদী পাতলো। খোকনমণির সেই খাটখানাও ভেতরে এনে ঢোকালো। অনেক জামা-কাপড় ও আরো টুকিটাকি জিনিসে বাক্সটি এমনভাবে গুছিয়ে নিলো যেন পথে আমার এতটুকুও কষ্ট না হয়।

আবার সেই ঘোড়ার পিঠেই যাত্রা। মেয়েটি এবার আমার বাক্সটি কোলে বসানোর আগে কোমরবন্ধের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে নিলো। বাড়ীর একটা ছোকরা চাকর মালপত্র নিয়ে ঘোড়ায় চেপে আমাদের পিছু পিছু চললো।

পথে এবার যে বিশেষ কষ্ট পেলাম না, তাও ঐ মায়াবী মেয়েটির জন্যই। কর্তার ইচ্ছে ছিল, পথে যেখানে যা গঞ্জ-বন্দর পড়বে সেখানেই আমাকে নামিয়ে এক চোট খেলা দেখিয়ে নেন। কিন্তু মেয়েটি তাতে রাজী তো হতোই না, এমন কি এক এক দিনে অনেক দূর যেতেও সে বেঁকে বসতো। অনেক সময় নিজের অসুখের ভান করে ও পথের মাঝে আমার ঘন ঘন বিশ্রামের সুবিধে করে দিতো। সে সময় বাক্স থেকে খোলা হাওয়ায় বের করে সে আমাকে মাঠ-ঘাট দেখিয়ে নিয়ে বেড়াতো। পাছে আমি হারিয়ে যাই বা দমকা হাওয়ায় উড়ে যাই সে ভয়ে কোমরের বাঁধন-দড়িটি কখনো হাতছাড়া করতো না।

গঙ্গার চেয়েও বড় পাঁচ-পাঁচটি নদী আমাদের পথে পড়লো। টেম্‌স্-এর মত পুঁচকে নদী এদেশে একটিও নেই। দশ সপ্তাহ ধরে আমরা শুধু চললাম। মেয়েটির ইচ্ছে না থাকলেও প্রায় আঠারোটি শহরে খেলা দেখাতে হলো। ছাব্বিশে অক্টোবর রাজধানীতে এসে পৌঁছলাম। এদেশে এ শহরটির নাম 'পৃথিবীর গৌরব'। বড় রাস্তার উপরেই ঘর পাওয়া গেল। রাজবাড়ীও কাছেই। দু'এক দিনের মধ্যেই মস্ত হল-ঘর ভাড়া নিয়ে খেলা দেখানো শুরু হয়ে গেল। হলখানা এপাশে-ওপাশে প্রায় তিন-চারশো ফুট। মাঝখানে একটি টেবিল, লম্বা চওড়ায় সেখানাও ষাট ফুটের কম নয়। পাছে পড়ে-টড়ে যাই এ ভয়ে তার উপরটা তিন ফুট উঁচু বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হলো।

মেয়েটির শেখানোর গুণে আজকাল ওদের ভাষায় আমি আরো ওস্তাদ হয়ে উঠেছি। খেলার ব্যাপারেও সে-ই আমার মাস্টারনী। আগের মতই খেলা চলতে লাগলো। আমার কাণ্ডকারখানা দেখে গোটা রাজধানীর মানুষ এসে ভেঙে পড়লো। সবারই মুখে এক কথা, বাহবা বাহবা, এমনটি আর হয় না। এমন আজগুবী মানুষ আর দেখিনি, শাবাশ ভাই শাবাশ।

রোজ দশবার করে এ ভাবে খেলা দেখাচ্ছি। খাটনির কথা না বলাই ভালো। চেহারা একেবারে হাড্ডি-সার হয়ে গেল। নিজেই বুঝতে পারছিলাম, এ রকম আর দুচার দিন চললেই অক্কা পেতে আর দেরী হবে না। মনিব মশায়েরও তা নজর এড়ায়নি। কিন্তু যতই তিনি বুঝতে পারছিলেন আমার আয়ু ফুরিয়ে আসছে ততই আরো বেশী করে তিনি আমাকে খাটিয়ে নিতে লাগলেন। মরার আগে যতটা পারা যায় পয়সা উশুল করে নেওয়াই তাঁর মতলব। মেয়েটি সবই বুঝতো। কান্নাকাটি করতো। কিন্তু কে তা শুনছে?

এমন সময় রাজবাড়ী থেকে রানীমা আমাকে ডেকে পাঠালেন।

আমার রূপ-গুণের কথা আগেই তাঁর কানে উঠেছিল। তিনি আমাকে দেখতে চান। হুকুম পেয়ে কর্তা খুব খুশি হলেন না। কিন্তু উপায় নেই। নিয়ে যেতেই হলো।

রানী ও তাঁর সখীরা আমাকে দেখে এত খুশি হবেন, ভাবতেই পারিনি। প্রথমেই টেবিলের উপর হাঁটু ভেঙে বসে তাঁদের নমস্কার জানালাম। রানী মিষ্টি হেসে তাঁর হাতের একটি আঙুল আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আমি দুহাতে জড়িয়ে ধরে তার ডগায় ঠোঁট ছোয়ালাম। অনেক কথা তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। আমার দেশের কথা, কোথায় কোথায় আমি ঘুরেছি, বাড়ীতে কে কে আছে, সব তাঁকে বলতে হলো। কথায় কথায় এক সময় হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, আমি তাঁর দরবারে থাকতে রাজী আছি কিনা!

মাথা নীচু করে আমি বললাম আমার মনিব মশায় বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন; তিনি কি আমাকে ছেড়ে দেবেন? যদি দেন, তবে এখানে থেকে আপনার সেবায় জীবন কাটানোর চেয়ে সুখের ও সৌভাগ্যের আর কি আছে?

শুনে তাঁর খুশি আর ধরে না। সঙ্গে সঙ্গেই মনিব মশায়কে তাঁর মনের কথা খুলে বললেন। মনিব তো আমাকে খরচের খাতায়ই লিখে রেখেছিলেন। রানীর হুকুমে যখন নগদ এক হাজার সোনার মোহর তাকে গুনে দেওয়া হলো, লোভে তাঁর চোখদুটো যেন চকচক করে উঠলো। ঘাটের মড়ার বদলে এত টাকা পেয়ে যাবেন তা তিনি ভাবতেও পারেন নি। তখনই আমাকে ছেড়ে দিলেন। আমিও যেন হাতে স্বর্গ পেলাম। কিন্তু মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে বুক ফেটে যাচ্ছিল। হাত জোড় করে রানীর কাছে মেয়েটির কথা সব খুলে বললাম। দয়া ও মমতায় ভরা এমন একটি মেয়েকে হারালে আমার যে কতখানি কষ্ট হবে, বুঝতে পেরে তিনি বললেন, ওর বাপ রাজী হলে ওকেও তিনি আমার দেখাশোনা করার জন্য এখানেই রেখে দিতে চান।

আহ্লাদে মনিব মশায়ের ত্বপাটি দাঁত আগে থেকেই বেরিয়ে পড়েছিল। এবার জোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে বললেন, তাঁর মেয়ে রানীমার দরবারে ঠাঁই পাবে এমন ভাগ্য তিনি চিন্তাও করতে পারেন না। হুজুরের যা মর্জি তাই হবে। যাক ভালোয় ভালোয় সব মিটে গেল।

লোকটা চলে যাবার সময় আমি ছোট্ট একটু নমস্কার ছাড়া তার দিক থেকে প্রায় মুখ ফিরিয়েই রইলাম। রানীর তা নজর এড়ায়নি। আমাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করতেই মন খুলে আমি তাঁকে সব কথা বলে ফেললাম। কি ভাবে লোকটা আমাকে পয়সা কামানোর কল হিসাবে খাটিয়ে মেরেছে, সারা দেশটা চষে বেড়িয়েছে, কিছুই চেপে রাখলাম না। মেয়েটি নিজেই তার সাক্ষী। শুনে রানী খুব ত্বঃখ পেলেন। আমার শরীরের হাল দেখেও আমার কথা যে খাঁটি তা বুঝতে পারলেন।

শেষটায় যখন বললাম যে এখন আমার মনভরা সুখ, বুকভরা আনন্দ,—তাঁর মত একজন দয়াময়ী রানীর কাছে থাকতে পেয়ে ভয় বা কষ্ট আর কিছুই নেই, আবার আমি নতুন জীবন ফিরে পেয়েছি, তখন তাঁর মুখখানা সুন্দর একটি মিষ্টি হাসিতে ভরে উঠলো। এমন ছোট্ট একফালি মানুষ যে অমন করে গুছিয়ে-গাছিয়ে কথা বলতে পারে তা দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। আদর করে হাতে তুলে নিয়ে একেবারে রাজার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

রাজা মশায়ের চেহারাটি গম্ভীর—একটু কাঠখোট্টা ধরনের। রানীর হাতের উপর আমাকে শোয়া অবস্থায় একনজর দেখেই তিনি আমাকে কোনো টিকটিকি বলে ঠাওরালেন! একটু ঠাট্টার সুরেই যেন রানীকে বললেন, টিকটিকি নিয়ে খেলা করবার শখ আবার কবে থেকে হলো?

'টিকটিকি নয়গো, দেখো' বলে রানী আমাকে তাঁর নাকের গোড়ায় এনে ত্বপায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দিলেন। বললেন, 'নাও

এবার নিজের কথা তুমি নিজেই বলো। আমিও রাজা মশায়কে নমস্কার করে অল্প কথায় আমার পরিচয় দিলাম। মেয়েটিকেও ডেকে আনা হলো। সেও আমার কথায় সায় দিয়ে আগাগোড়া সব কাহিনী গড়গড় করে বলে গেল।

রাজা লেখাপড়া-জানা মানুষ। গণিতে ও দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত। তিনি এ কথা বিশ্বাস করবেন কেন? বেশ একটা রসালো গল্প মনে করে উড়িয়ে দিলেন। আমাকে দেখেও তিনি মানুষ বলে মনে করলেন না। ভাবলেন পাকা কারিগরের হাতে তৈরী মানুষ-রূপী কোনো কল। দম-দেওয়া পুতুলের মত শেখানো কোনো বাঁধা বুলি আউড়ে যাচ্ছি। কিন্তু আর একদিকে, আমার কথাবার্তায় ও গলার আওয়াজে জ্ঞান-বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে অবাকও কম হচ্ছিলেন না।

ভালো করে পরখ করার জন্য তিনি আমাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করলেন। আমিও ঠিক ঠিক জবাব দিলাম। শেষমেশ পণ্ডিতদের ডাক পড়লো। তাঁরাও রাজার মতই আমাকে মানুষ না মনে করে ভগবানের খেয়ালে তৈরী কোনো এক আজগুবী জিনিস বলেই রায় দিলেন।

অন্যান্য রাজার মত এ রাজার সভায়ও একটি ভাঁড় ছিল। ওর চেয়ে বেঁটে-বক্কেশ্বর ও দেশে আর একটিও ছিল না। লোকটা মোটে তিরিশ ফুট লম্বা। রাজারানীর হাঁটুর গোড়ায় পড়ে থেকে তাদের পা চাটা আর মোসাহেবী করাই তার একমাত্র কাজ ছিল। আমি অবশ্য তার কড়ে আঙুলেরও সমান নই। অন্তত কাছাকাছি হলেও না হয় ওঁরা আমাকে ঐ ধরনের কোনো বামন বলে ধরে নিতে পারতেন। তবু নাছোড়বান্দা হয়ে পণ্ডিতদের আমি বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে তাদের ধারণা ঠিক নয়। আমিও একজন মানুষ। বিলেতে আমার দেশ, সেখানে আমার মত কোটি কোটি মানুষ আছে। এখানকার মতই রাজারানীও আছেন। কিন্তু সে কথায় কেউ আমল দিলো না। রাজা অবশ্য এসব পণ্ডিতের চেয়ে কিছু

বেশী বুদ্ধিই রাখতেন। তিনি মনিব-বাড়ীর সবাইকে ডেকে আমার কথা আর একবার যাচাই করে নিলেন। তারপর কি জানি কি ভেবে রানীকে আমার উপর খুব যত্ন নিতে বললেন।

প্রাসাদের মধ্যেই সুন্দর ঘর, লেখাপড়া শেখানোর জন্য একটি মাস্টারনী ও দুটি চাকর মেয়েটিকে দেওয়া হলো। ঐ ঘরেরই এক কোণে ষোল ফুট লম্বা-চওড়া আর বারো ফুট উঁচু আর একটি কাঠের ঘর তৈরী হলো। সেটি আমার নিজের। দরজা, জানালা, স্নানঘর, খাট, দোলনা, হাতির দাঁতের একজোড়া চেয়ার-টেবিল, ছোট্ট একটি আলমারী—সব কিছুই পেলাম। এ ঘরটিরও চার দেয়াল, ছাদ, মেঝে সব কিছুই মোলায়েম তুলোর গদী দিয়ে মুড়ে দেওয়া হলো। খাটে রেশমের বিছানা, সাটিনের লেপ-তোষক। আমাকে আর পায় কে? রোজ রানীর কাছে বসেই আমাকে খেতে হতো। আলাদা রূপোর ডিশ্-প্লেট, কাঁটা-চামচেয় আমি খেতাম। অবশ্য ওদের তুলনায় সেগুলো পুতুলের খেলনা বলেই মনে হতো। খাওয়ার পর সেগুলো ধুয়ে মুছে ছোট্ট একটি রূপোর বাক্সে ভরে মেয়েটি তার পকেটে তুলে রাখতো।

রানীর সঙ্গে তাঁর দুই মেয়ে ছাড়া আর কেউ খেতে বসতো না। বড় রাজকুমারীর বয়স ষোল আর ছোটটির তেরো। ছোট্ট ছোট্ট হাতে কণা কণা মাংস কেটে নিয়ে টুক টুক করে আমার মুখে দেওয়া দেখে দুজনেই হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়তেন। রানীর পেটের গোলমাল ছিল। তিনি বিশেষ কিছু খেতেন না, তবু এক এক গরাসে যা মুখে পুরতেন তা আমাদের দেশের এক ডজন মানুষের এক বেলার খাবার। ইংলণ্ডের সব চেয়ে বড় নয়টি মুরগীর সমান এক এক টুকরো মাংস মুখে দিয়ে হাড়-মাংস শুদ্ধ যখন তিনি কড়মড়িয়ে চিবোতে থাকতেন, আমার যেন গা গুলিয়ে উঠতো। যে সোনার কাপটিতে তিনি জল খেতেন তাতে এক পিপে জল ধরতো। সেটুকু তিনি এক চুমুকে শেষ করতেন।

প্রত্যেক বুধবার রাজা রানী এক সঙ্গে বসে খেতেন। এ খাওয়া হতো রাজার মহলে। আমাকেও সেই খাবার-টেবিলে নিমকদানীর পাশে বসতে দেওয়া হতো। খেতে খেতে রাজা আমার সঙ্গে গল্প করতেন। ইউরোপের অনেক কথা তিনি জানতে চাইতেন। ইংলণ্ডের কথাও উঠতো। খুশি মনে আমিও আমার দেশের কথা বলতাম। তার বিশাল ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা, জলে স্থলে তার সৈন্যদের মহাবীরত্বের কথা, পার্লামেণ্টে 'হুইগ', 'টোরী' প্রভৃতি নানা দলের কথা, ক্যাথলিক, প্রটেস্‌টেণ্ট-এর কথা, অনেক কিছুই বেশ গর্বের সঙ্গে তাঁকে শোনাতাম। কিন্তু ভীষণ দুঃখ হতো, যখন শোনার পর তিনি দু আঙুলে আমাকে তুলে নিয়ে মুখের কাছে ধরে হঠাৎ হো-হো করে হেসে সে সব কথা বেমালুম উড়িয়ে দিতেন।

জাহাজের বড় মাস্তুলের মত লম্বা তাঁর প্রধানমন্ত্রীও পেছনেই দাঁড়িয়ে থাকতেন। তাঁর দিকে মুচকি হেসে বলতেন, পুঁচকেটা কি বলে শুনেছো? এই পোকাগুলোও নাকি দেশ শাসন করে! বাড়ী বানায়, শহর বানায়, লড়াই করে, জমি চাষ করে, ব্যবসা করে! ঝগড়া-মারামারি, ভালবাসা, বেইমানী সব কিছুই করে!

সবচেয়ে রাগ হতো রানীর পেয়ারের ঐ ভাঁড় ব্যাটাকে দেখলে। বিটকেলটা আমাকে একটা পোকার চেয়েও অধম মনে করতো। আমার সামনে এলেই চোরা-চোখে মুচকি হেসে শয়তানটা বুক টান করে দাঁড়িয়ে নিজে যে আমার চেয়ে কতখানি লম্বা-বাহাদুর তা দেখাতে চেষ্টা করতো। মাঝে মাঝে আমার চেহারা নিয়ে নোংরা ফচ্‌কেমি করতেও ছাড়তো না। আমি কিছুই যেন গায়ে মাখিনি— এই ভাবে চুপ করে থাকতাম। দু'এক সময় উল্টো ঠাট্টা করে বলতাম, এসো না একবার বাছাধন, লড়ো না আমার সঙ্গে এক হাত, দেখো না একটি গাঁট্টায় কেমন করে কাবাব বানিয়ে ছেড়ে দিই। শুনে সবাই হাসতে হাসতে ফেটে পড়তো।

একদিন একলা ঘরে পেয়ে নচ্ছারটা আমায় খুব নাকাল করেছিল।

বলা নেই, কওয়া নেই, খপ্‌ করে আমাকে তুলে নিয়ে মস্ত এক বাটি ক্রিমের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। তারপর দাঁত মেলে শেয়ালের মতো খ্যাঁক-খ্যাঁক করে কি তার হাসি! আচমকা নাকানি-চুবানি খেয়ে প্রথমটায় বেশ কিছু নাজেহাল হলেও, ভালো সাঁতার জানতাম বলে বাটির মধ্যে তলিয়ে যাইনি। মেয়েটিও নেই, কাকেই বা ডাকি? হঠাৎ রানী ঘরে ঢুকলেন। আমাকে ওভাবে দেখে তিনিও এমন ঘাবড়ে গেলেন যে কি করবেন ভেবে না পেয়ে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে পড়লেন। ভাগ্যিস ঠিক সে সময় মেয়েটি এসে আমাকে টেনে তুললো, নইলে কি দশা হতো ভগবানই জানেন। এজন্য দু'এক-দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হলো।

বদমায়েশটাকে ধরে এনে সঙ্গে সঙ্গে বেত লাগানো হলো। বাটির সমস্ত ক্রিমটাও জোর করে তাকে গেলানো হলো। নিমপাতার রস খাওয়ার মত মুখ করে ব্যাটা যখন তা গিলছিল, চাকর-বাকররা হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিল। পরদিনই ওকে দরবার থেকে দূর করে দেওয়া হলো।

চার

ব্রব্ডিংনাগ নামটা অদ্ভুত হলেও দেশটা মস্ত বড়। রাজধানীটি মাঝখানে রেখে চারদিকে প্রায় দুহাজার মাইল ছড়ানো। এর প্রায় সবটাই আমি ঘুরেছি। সমুদ্রের ধারটা পাহাড়ে ঘেরা। পাহাড়-গুলো তিরিশ মাইলের মত উচু। টপকে পার হবার কোনো উপায় নেই, কারণ তাদের মাথায় মাথায় একটির পর একটি আগ্নেয়গিরির সার। কখন যে কোন্‌টা ফেটে ফুটে প্রলয়কাণ্ড বাধিয়ে বসবে, কে জানে? পাহাড়ের ওপারে কি আছে কেউ জানে না। সমুদ্রের পারে শহর বন্দর বলতে কিছুই নেই। দু'একটি যা আছে তা কেবল বড় বড় নদীর ধারেই। কাজেই দুনিয়ার আর কোনো দেশের সঙ্গে জলপথে এঁদের কোনো যোগাযোগই নেই।

নদীগুলোতে যেমন গাদা গাদা নৌকা ও জাহাজের ভিড়, তেমনি ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ। তিমির মাংস এখানকার খুব পোশাকি খাবার। তিমিগুলো বড়ও হয় খুব, তবে সত্যি কথা বলতে কি, এর চেয়েও বড় তিমি আমি গ্রীনল্যাণ্ডে দেখেছি।

দেশে লোকের বাসও অনেক। গাঁয়ের সংখ্যা যে কত তার হিসেব করাই দায়। দেয়াল-ঘেরা বড় শহর কম করেও শ'খানেক হবে, আর লণ্ডনের মত মহানগরও আছে প্রায় একান্নটি। রাজধানী শহরটি নদীর দুপারে লম্বায় প্রায় চুয়ান্ন মাইল আর চওড়ায় আড়াই মাইল নিয়ে ছড়ানো। দালান-কোঠার সংখ্যা আশী হাজারের কম নয়। মোট ছয় লাখের মত মানুষ সেখানে বাস করে।

রাজপুরীটিও প্রায় সাত মাইল জায়গা নিয়ে তৈরী। বড় বড় মহলগুলো একটিও আড়াইশো ফুটের চেয়ে নীচু নয়। আর একটি দেখবার জিনিস ওখানকার বড় মন্দিরটি। তার আকাশ-ছোঁয়া

চূড়াটি সারা দেশের মধ্যে সব চেয়ে উঁচু—প্রায় তিন হাজার ফুট। ভেতরে হাজার হাজার কুলুঙ্গী বোঝাই কত যে দেব-মূর্তি। ঘুরে ঘুরে দেখার সময় মনিব মশায়ের মেয়েটি এক জায়গায় হঠাৎ একটি পাথরের আঙুল কুড়িয়ে পায়। হয়তো কোনো পুরোনো মূর্তির হাত থেকে ভেঙে সেটি নিচে পড়েছিল। রুমালে মুড়ে মেয়েটি তা তুলে নিয়ে পকেটে রাখছিল। তার আগেই আমি সেটি মেপে দেখলাম, ওরে বাবা, পুরো চার ফুট এক ইঞ্চি লম্বা, অর্থাৎ আড়াই হাতেরও বেশী।

রাজার রান্না-বাড়ী আর ঘোড়াশালা দেখলেও তাক লেগে যায়। রান্না-বাড়ীর ছাদ মাটি থেকে ছয়শো ফুট উঁচু। ভেতরে ইয়া-ইয়া সব ডেকচি, কড়াই, বাসন-কোসন। কেটলি, কাপ থরে থরে সাজানো। বিরাট বিরাট সব উনুনের ডগায় পেল্লায় পেল্লায় প্যান বসানো। তাদের উপর পাহাড়ের মত মস্ত মাংসের চাঙড় চড়-বড়িয়ে ফুটছে। দেখলে মাথা ঘুরে যায়।

ঘোড়াশালায় ছয়-ছয়শো ঘোড়া। এক একটা পঞ্চাশ-ষাট ফুট উঁচু আর তেমনি জোয়ান। কোনো কোনো দিন তাদের নিয়ে মিছিল বের হয় ঝলমলে পোশাক পরে। রাজা থাকেন আগে ; আর তাঁর পেছন পেছন দরবারের হোমরা-চোমরাদের নিয়ে সেই পাঁচ-ছয়শো ঘোড়া ঘাড় বাঁকিয়ে, কেশর ফুলিয়ে যখন চলতে থাকে. তার মত সুন্দর আর কিছুই ভাবা যায় না।

রাজবাড়ীতে আমার থাকার জন্য যে কাঠের ঘরটি বানানো হয়েছিল তার কথা আগেই বলেছি। ঐটি ছাড়াও বাইরে চলা-ফেরার জন্য আরো একটি চৌকো বাক্স তৈরী হয়েছিল। বারো ফুট বড় আর দশ ফুট উঁচু এই বাক্সটি খুব আরামসই। দিব্যি ফিটফাট দোর-জানালা, দেয়ালের উঁচুতে ঘুলঘুলি। মজবুত করার জন্য চারদিকে লোহার জাল দিয়ে মোড়ানো। চলা ফেরার সময় যাতে ঝাঁকুনি না লাগে সেজন্য বাক্সটির ভেতর ঘুলঘুলি বরাবর একটি

দোলনাও টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে শুয়ে দোল খেতে খেতে দিব্যি চারদিক দেখতে দেখতে যাওয়া যেতো। রাজারানীর সঙ্গে বাইরে বেরোবার সময় আমি এর মধ্যেই থাকতাম। কখনো মেয়েটির কোলের উপর, কখনো ঘোড়ার পিঠে, কখনো বা রাজারানীর দামী গাড়ীতে বাক্সটি বসানো থাকতো। আশে পাশের লোকজনেরা দেখতে চাইলে বাক্সশুদ্ধ আমাকে একটি খোলা পাল্‌কির উপর নামিয়ে রাখা হতো। বাক্সটি কেউ ছুঁতে পারতো না। দরকার হলে মেয়েটি নিজের হাতে তা উঁচু করে তুলে সবাইকে দেখাতো।

মোটামুটি মন্দ ছিলাম না, কিন্তু বরাতে সইলো না। পরপর এমন কতকগুলো বিপদ ঘটে গেল, যাতে ভারী ভাবনায় পড়ে গেলাম।

একদিন মেয়েটি আমাকে বাক্স সমেত রাজবাড়ীর বাগানে হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে এসেছে। ডালা খুলে আলগোছে তুলে সে আমাকে ঘাসের উপর ছেড়ে দিয়েছে। আমি এধার-ওধার পায়চারী করে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ সেই বেঁটে বদমায়েশটা কোথা থেকে এসে হাজির! আমরা কেউ দেখতেই পাইনি। বাগানে খুব ছোট ছোট কয়েকটা আপেল গাছ ছিল। তারই একটির নীচে দাঁড়িয়ে আমি তখন মেয়েটিকে বলছিলাম, দেখ, অন্য গাছের তুলনায় এ গাছগুলো কি বিশ্রী রকমের বেঁটে! বাঁটকুলটা ভাবলো ওকেই বুঝি আমি খোঁটা দিচ্ছি। খেপে গিয়ে বজ্জাতটা ছুটে এসে গাছটার ডাল ধরে এইসা ঝাঁকুনি দিতে লাগলো যে ঝুপ ঝাপ করে অনেকগুলো আপেল গাছতলায় ছিঁড়ে পড়লো। আপেল তো নয়, যেন আধ-মনি এক একখানা পিপে। পালিয়ে আসার আগেই দুম করে তার একটা এসে আমার পিঠে পড়লো, আর সঙ্গে সঙ্গেই মুখ থুবড়ে মাটির উপর পড়ে আমি একদম ব্যাঙ-চ্যাপ্‌টা হয়ে গেলাম। শয়তানটা দাঁত বের করে হাসতে লাগলো।

আর একদিন ঘাসের উপর আমাকে বসিয়ে দিয়ে মেয়েটি তার মাস্টারনীর সাথে গল্প করতে করতে খানিকটা দূরে চলে গিয়েছিল। হঠাৎ আচমকা এমন শিলাবৃষ্টি শুরু হলো যে মাটির উপর উবু হয়ে পড়েও রেহাই পেলাম না। শিলগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে আমার গায়ে পিঠে এসে পড়তে লাগলো। মনে হচ্ছিল এক সঙ্গে অনেকগুলো লোহার টেনিস বল ছুঁড়ে ছুঁড়ে কে যেন আমায় মারছে। গা-গতর ফুলে, হাত-মুখ ছড়ে, ছাল-চামড়া উঠে এমন হলো যে দশ-বারো দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হলো। কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে মেয়েটি বুক দিয়ে আমায় আগলে রেখেছিল তাই রক্ষে। নইলে সেদিন হয়তো মরেই যেতাম।

এরপরে কাণ্ডটি আরো ভয়ানক। সেও ঐ একই বাগানে। অবশ্য আমারও কিছুটা দোষ ছিল। বাক্স থেকে বের করার সময় প্রায়ই আমি মেয়েটিকে বলতাম, আমাকে একটু নিরিবিলি জায়গায় নামিয়ে দাও না, একলা বসে নিজের মনে চুপচাপ একটু ভাবি। মেয়েটি বিশেষ রাজী হতো না। কিন্তু সেদিন আমার পীড়াপীড়িতে তাই করলো। বাগানের এক কোণে আমাকে বসিয়ে রেখে, দুটি মেয়ের সাথে কথায় কথায় কোথায় যেন গেল। মনের খেয়ালে বসে বসে এটা-ওটা ভাবছি, হঠাৎ বাগানের বড় মালীর পোষা স্প্যানিয়েল কুকুরটা ইয়া-লম্বা জিভ্ বের করে বাঘের মতো আমার কাছে এসে হাজির! জন্তুটার এখানে আসার কথা নয়। কিন্তু যে ভাবেই হোক, ছাড়া পেয়ে মালীর নজর এড়িয়ে কখন যে চলে এসেছে! আমার গন্ধ পেয়ে এক লাফে সে আমাকে মুখে তুলে নিয়েই দে ছুট। একেবারে তার মনিবের কাছে এনে তার পায়ের গোড়ায় আমাকে নামিয়ে রেখে সে ল্যাজ নাড়তে লাগলো। মালী বেচারীর তো আত্মারাম খাঁচা ছাড়া। কুকুরটা খুব শিক্ষিত, তাই বাঁচোয়া। নইলে যে ভাবে সে আমাকে দাঁতে ধরে তুলেছিল, তাতে আমার শরীর ছিঁড়ে-খুঁড়ে একাকার হয়ে যেতে পারতো। কিন্তু গায়ে

একটি আঁচড় লাগা দূরে থাক্, আমার জামার কাপড়ে পর্যন্ত কোথাও একটু চিড় খায়নি।

মালী আমাকে ঝেড়ে পুঁছে, কোলে তুলে নিয়ে এক দৌড়ে মেয়েটির কাছে পৌঁছে দিলো। ভয়ে সে তখন ঠক-ঠক করে কাঁপছে। হাতজোড় করে বার বার আমার কাছে মাপ চাইতে লাগলো। যেন রাজারানীর কানে একথা না তুলি। তা হলে তার চাকরি তো যাবেই এমন কি কাঁধ থেকে মুণ্ডুটাও খসে যেতে পারে।

এর পর থেকে মেয়েটি আর কখনো আমাকে এ ভাবে ছেড়ে দিতো না।

এ ছাড়া ছোটখাটো আপদ-বিপদেরও শেষ ছিল না। দু'একটির কথা বলি।

একদিন বাগানে বেড়াচ্ছি। মেয়েটিও কাছে কাছেই আছে। হঠাৎ কোথা থেকে একটা বাজ-পাখি উড়তে উড়তে শোঁ করে নীচে নেমে এলো। আর একটু হলেই ছোঁ মেরে আমাকে নখে তুলে নিয়ে চম্পট দিচ্ছিল। সময় মত তলোয়ারখানা বের করে মাথার উপর ঘোরাতে ঘোরাতে ঝোপের ভেতর গিয়ে লুকোতে পেরেছিলাম তাই রক্ষে।

আর একদিন তো একটা শামুকের খোলায় হোঁচট খেয়ে ডান পায়ের হাড়ই ভেঙে বসলাম। বেশ কয়েকদিন বিছানায় পড়ে কাত্‌রাতে হলো।

ছোট ছোট পাখিরা কিন্তু আমাকে দেখে একেবারেই ভয় পেতো না। একদম আমার গায়ের কাছে এসে মাটি থেকে ছোট ছোট পোকা-মাকড় ঠুকরে ঠুকরে খেতো। একদিন একটি 'থ্রাশ্' পাখি ভারী মিষ্টি গলায় আমার দুহাত দূরে দাঁড়িয়ে গান গাইছিল। একটু আগেই মেয়েটি আমাকে সকালের খাবার দিয়েছে। আমি বসে বসে তাই খাচ্ছি, আর গান শুনছি। হঠাৎ টুপ করে সে

আমার কাছে এসে ঠোঁট দিয়ে এক টুকরো কেক আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পালিয়ে গেল।

কখনো কখনো এদের আমি হাত বাড়িয়ে ধরতে চাইতাম। কিন্তু ওরা এমন চালাক যে ধরা তো দিতোই না,—টুক করে পালিয়ে গিয়েই আবার দলবল নিয়ে আমার উপর চড়াও হতো। একবার একটা চড়ুই পাখিকে ছোট্ট একটি মুগুর ছুঁড়ে মেরেছিলাম। পাখিটা ঘা খেয়ে মাটিতে পড়ে যেতেই খুশিতে আটখানা হয়ে তাকে একেবারে মেয়েটির কাছে নিয়ে গেলাম! আমার বাহাদুরী দেখে সে হাসতে লাগলো। পাখিটার বিশেষ চোট লাগেনি। একটু পরেই সেটা নড়ে চড়ে উঠে বসলো। আর ঠোঁট ও ডানা দুটো দিয়ে আমাকে এমন করে ঠোকর ও ঝাপ্‌টা মারতে লাগলো যে বাধ্য হয়েই তাকে ছেড়ে দিতে হলো। চড়ুই হলে কি হবে? পাখিটা গায়ে-গতরে আমাদের দেশের রাজহাঁসকেও হার মানায়।

আর একদিন রানী হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, আমি নৌকায় পাল খাটাতে বা দাঁড় বাইতে জানি কিনা। তাঁর সাধ ব্যায়াম হিসেবে আমি একটু নাও-টাও বাই। আমি বললাম বেশ তো, মন্দ কি? মোটামুটি এ সব আমি পারি এবং ভালোও বাসি। কিন্তু আপনাদের ডিঙি মানে তো আমাদের দেশের এক একখানা যুদ্ধের জাহাজ। কি করে তাতে দাঁড় বাইতে পারবো?

রানী বললেন, ঠিক আছে, সবুর করো। একটি ছোট্ট নৌকা তোমাকে বানিয়ে দিচ্ছি—ঠিক যেমনটি হলে তোমার হয়।

দিন দশেকের মধ্যেই তা তৈরী হয়ে গেল। আমার মতন সাত-আটজন তাতে বসতে পারে। রানী তখন ছুটে গিয়ে রাজাকে সব কথা বললেন। তিনি বললেন, এবার জল ভরতি একটা চৌবাচ্চার মধ্যে নৌকোটি ছেড়ে দাও। গালিভার যত খুশি চালিয়ে নিয়ে বেড়াক।

রানী বললেন, না, না, এসব পুঁচকে চৌবাচ্চা নয়। তার চেয়ে মস্ত বড় একটা কাঠের চৌবাচ্চা বানানো যাক। পুরোপুরি পাল খাটিয়ে, সামনে দুখানা দাঁড় বেয়ে অনেক দূর অবধি ও ভেসে বেড়াতে পারবে, কি বলো?

রাজার হুকুমে তাই করা হলো। চৌবাচ্চাটি লম্বায় হলো তিনশো ফুট আর চওড়ায় পঞ্চাশ—ছোটখাটো একটি দীঘি আর কি! চাকর আধ ঘণ্টার মধ্যেই সেটা জলে ভরতি করে ফেললো। তলার দিকটায় কল লাগানো ছিল। দুদিন পর পর সেখান দিয়ে বাসি জল বের করে দেওয়া হতো।

আঃ—এই না হলে মজা!

রোজই নাওটি নিয়ে মনের আনন্দে আমি ভেসে বেড়াতাম। রানী ও তাঁর সহচরীরা চারদিকে বসে তাই দেখতেন। অনেক সময় আয়েসে পাল তুলে দিয়ে আমি হালটি ধরে বসে থাকতাম, তাঁরা তাঁদের হাত-পাখা নেড়ে পালের উপর ঝড়ের মত হাওয়া দিতেন আর তরতর করে নৌকো ছুটে চলতো। হাত ধরে গেলে চাকরানীদের ডাক পড়তো। তারা পালের উপর গাল ফুলিয়ে ফুঁ দিয়ে নাও চালু রাখতো, আর রানী হেসে লুটোপুটি খেতেন।

খেলা শেষ হয়ে গেলে নৌকোটি জল থেকে তুলে একটি পেরেকের গায়ে ঝুলিয়ে রাখা হতো।

একদিন এতেও একটা অঘটন ঘটলো। দোষ, বলতে গেলে চাকরটারই, কিন্তু বেচারী দেখতে পায়নি। চৌবাচ্চাটায় জল ভরার সময় সেদিন কি করে একটা কোলা-ব্যাং ওর মধ্যে এসে পড়েছিল। হয়তো জল তোলার সময় কুয়ো থেকেই উঠে জলের তলায় ঘাপটি মেরে ছিল। আমিও নৌকোয় উঠেছি আর ওটাও এক লাফে তার উপর এসে পড়লো। কাৎ হয়ে, নাও উল্‌টিয়ে আমিও প্রায় হুমড়ি খেয়ে জলে পড়ছিলাম কিন্তু আর এক লাফে ব্যাংটা একেবারে বোটের মাঝখানে চলে এলো বলেই বেঁচে গেলাম।

আমি টাল সামলিয়ে ওর দিকে ফিরে চাইতেই ব্যাটা আর একটি মস্ত লাফে আমার মাথা ডিঙিয়ে একেবারে পেছন দিকে এসে পড়লো। কাণ্ড দেখে মেয়েটি ছুটে আসছিল, কিন্তু তার আগেই আমি বৈঠা তুলে ওর গায়ে কষে এক ঘা বসিয়ে দিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গেই ঝপাং করে ওটা জলে লাফিয়ে পড়েছে। গায়ে মুখে লালায় আর জলে মাখামাখি হয়ে সে এক বিদঘুটে অবস্থা।

সব চেয়ে ভয়ানক কাণ্ড হয়েছিল একটা হনুমানকে নিয়ে। একেবারে প্রাণেই মারা পড়তাম। নেহাৎ ভাগ্যের জোরে বেঁচে গিয়েছিলাম।

দিনটা ছিল খুব গরম। মেয়েটি আমাকে বাক্সের ভেতর দোর বন্ধ করে রেখে কোথায় যেন গিয়েছিল। হাওয়ার জন্য জানালাগুলো সবই খোলা। আমি চেয়ারে বসে পা দোলাচ্ছি, হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনে চমকে উঠলাম। মনে হলো কে যেন ধপ্ করে জানালার গোড়ায় লাফিয়ে পড়লো। চোখ ফিরিয়েই দেখি, মস্ত একটা হনু হুম্ হুম্ করে লাফাচ্ছে আর আমার দিকে তাকিয়ে ভেংচি কাটছে। যেমন হাতির মতন শরীর, তেমনি আগুনের মত টকটকে লাল মুখ। দাঁত খিঁচিয়ে বার কয়েক সে আমার জানালায় উঁকি ঝুকি দিলো, তারপর হাত বাড়িয়ে বিড়ালের ইঁদুর ধরার মত খপ্ করে আমাকে ধরেই একটানে বাইরে নিয়ে এলো। ভেবে-ছিলাম খাটের নীচে গিয়ে লুকোবো কিন্তু সময় পেলাম না। ওর মুঠোর মধ্যে যতই আমি ছটফট করি ততই ও আমাকে আরো জোরে চেপে চেপে ধরে। ও হয়তো ভাবছিল আমিও ওদেরই জাতের কোনো ছোট বাচ্চা-টাচ্চা হবো।

ঠিক সে সময়েই মেয়েটি এসে পড়লো! হনুটার হাতে আমাকে ও ভাবে দেখেই বেচারী এমন চীৎকার জুড়ে দিলো যে জানোয়ারটাও আমাকে নিয়ে এক লাফে একেবারে পাশের দালানের ছাদে গিয়ে চড়ে বসলো। মেয়েটা পাগলের মত বুক চাপড়াতে লাগলো।

হৈ-হৈ করে লোকজন সব ছুটে এলো। মই কোথায়, মই কোথায় বলে চাকরগুলো ছুটোছুটি করতে লাগলো। রাজবাড়ীর যে যেখানে ছিল দালানের নীচে এসে জড়ো হলো; কিন্তু কেউ কিছু ভেবে পেলো না কি করে আমাকে বাঁচানো যায়। এর মধ্যে বাঁদরটা, মা যেমন করে বাচ্চাকে খাওয়ায় তেমনি করে আমার মুখের মধ্যে কি যেন সব গুঁজে দিতে লাগলো। ঘেন্নায় যতই থু থু করে আমি তা ফেলে দেই, ততই সে আমার পিঠে চাপড় মারে আর বেশী করে মুখের মধ্যে গুঁজে দেয়। দম বন্ধ হয়ে প্রায় মরি আর কি!

ততক্ষণে মই বেয়ে অনেক মানুষ উপরে উঠে এসেছে। দেখেই হনুটা ধপ্‌ করে আমাকে ছাদের টালির উপর ফেলে দিয়ে একলাফে হাওয়া হয়ে গেল। আমার তখন জ্ঞান-গম্যি নেই। হতভম্বের মতই সেই পাঁচশো গজ উঁচুতে ছাদের চূড়ায় বসে আছি। মনে হচ্ছে এই বুঝি মাথা ঘুরে গড়িয়ে পড়ি, এই বুঝি হাওয়ার তোড়ে উড়ে যাই। যা হোক, ছোকরা গোছের একটা চাকর গুটি গুটি এসে আমাকে ধরে ফেললো। তারপর পায়জামার পকেটে ভরে নিয়ে নীচে নামলো। মুখের ভেতর তখনো সেই নোংরা জিনিস-গুলো গিজগিজ করছিল। মেয়েটি একটি খড়কে দিয়ে খুঁটে খুঁটে সেগুলো বের করে ধুয়ে মুছে মুখ পরিষ্কার করে দিলো। হনুটার হাতের কচলানিতে গা-গতর ফুলে উঠেছিল। হাড়-গোড়ে পাকা ফোঁড়ার মত ব্যথা। পনেরো দিনের মত বিছানা নিলাম। ডাক্তার-বদ্যি সব ছুটে এলো। রাজারানীও দুবেলাই দেখতে আসতেন। হনুমানটাকে পাকড়াও করে মেরে ফেলা হলো। হুকুম হয়ে গেল রাজবাড়ীতে আর কোনদিন বাঁদর ঢুকলে দারোয়ানের ফাঁসী হবে।

ধীরে ধীরে আমি সেরে উঠলাম। কিন্তু মেয়েটি জ্বরে পড়লো। আহা, আমার অসুখে ভারী খাটা-খাটুনি গেছে বেচারীর। মনটা খুব দমে গেল। ওর মাস্টারনী বললেন, হাওয়া বদলের জন্য ওকে বাইরে নিয়ে যাওয়া দরকার। ওর সঙ্গে অবশ্য আমিও। শহর

থেকে তিরিশ মাইল দূরে সুন্দর একটি জায়গা। রাজার একটি বাগানবাড়ীও সেখানে আছে। সেখানে যাওয়াই ঠিক হল। এবার আর ঘোড়ায় নয়। গাড়ীতে করে চললাম। পথে জিরিয়ে নেবার জন্য এক জায়গায় একটু নামলাম। আমি আমার সেই ছোট্ট বাক্সটির মধ্যেই ছিলাম। মেয়েটি তা হাতে ঝুলিয়ে হাঁটছিল আর তার মাস্টারনীর সাথে গল্প করছিল। আগের দিন বৃষ্টি হয়েছে। পথে একজায়গায় জল জমে আছে। মেয়েটিকে বললাম, একটু নামিয়ে দাও না, এক লাফে জলটুকু পার হয়ে যাই।

মেয়েটি রাজী হয় না, কিন্তু অনেকবার বলতে বাক্স খুলে সে আমাকে পথের উপর ছেড়ে দিলো। আমিও জলটুকু পার হবার জন্য চেষ্টও বলে এক লাফ দিলাম, কিন্তু পার হওয়া চুলোয় যাক, ধপাস্ করে একেবারে জল-কাদার মধ্যে গিয়ে পড়লাম। জামা-কাপড়, নাকমুখ কাদায় মাখামাখি হয়ে সে এক বিচ্ছিরি কাণ্ড।

রাজবাড়ীতে ফিরে আসার পর এই নিয়ে রানীর মহলে হাসাহাসির ঢেউ খেলতে লাগলো।

পাঁচ

দুবছর পার হয়ে আজ তিনবছরে পড়লো, আমি এ দেশে এসেছি। ঠিক লিলিপুটের মত এখানেও এক এক দিন এমন মন খারাপ হয়ে যেতো যে বসে বসে সাত-পাঁচ ভাবা ছাড়া আর কিছুই ভালো লাগতো না। দুচোখ ভরে কেবল জল আসতো। কোথায় আমার দেশ আর কোথায় আমি! আর কি কোনদিন সেখানে ফিরে যেতে পারবো? মনের ভেতর কে যেন বলে উঠতো না-না-না, কখনো না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার কে যেন বলতো, পারবে-পারবে, নিশ্চয় পারবে।

আমিও ঐ শেষের আশাতেই বেঁচে থাকতাম। পারবো, পারবো, আবার আমার সোনার দেশ দেখতে পাবো। প্রাণের চেয়েও প্রিয় আমার বউ ছেলেমেয়েদের ফিরে পাবো।

রাজা ঢোল পিটিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁর দেশের ধারে কাছে কোন বিদেশী জাহাজ দেখা মাত্র আটক করে তার লোকজনদের যেন রাজধানীতে নিয়ে আসা হয়। তিনি ভেবেছিলেন, এ ভাবে ইংলণ্ডের বা ইউরোপের মেয়ে হাতে পেলে আমার সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে আমাকে ওদেশেই রেখে দেবেন। কিন্তু সে কথা ভাবতেও আমার মন বিষিয়ে উঠতো। তা হলে তো আমাকে ও তাকে খাঁচায় বন্দী ক্যানারী পাখির মতই বেঁচে থাকতে হবে। যে দেখবে সেই হাসবে। বলবে, দেখি দেখি, বাঃ এমন আজব চিজ্ তো কখনো দেখিনি! আজ রাজবাড়ীতে আছি, কাল হয়তো আর কেউ কিনে নিয়ে যাবে। জন্তু-জানোয়ারের মত খাঁচায় পুরে হাটে-দেখিয়ে পয়সা রোজগার করবে। চিড়িয়াখানাতে পশুপাখিদের যে ভাবে খাওয়ায় তেমনি করে খাওয়াবে; কেউ খোঁচাবে, কেউ

ঢিল ছুঁড়বে, তারপর মরে গেলে ঠ্যাং ধরে ভাগাড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। ছিঃ, এ অপমানের জীবন থেকে মরণও অনেক ভালো।

এই সব নানা ভাবনায় মন যখন পাগলের মত, হঠাৎ খবর পেলাম রাজা রানী দুজনেই বাইরে যাচ্ছেন। এবার আর ধারে-কাছে কোথাও নয়, অনেক দূরে—একেবারে দক্ষিণ সমুদ্রের ধারে। অন্যবারের মত এবারও আমি তাঁর সঙ্গে যাবো, আর আমার সাথে মেয়েটিও। খবরটা শুনেই, কেন জানি না, মনটা হঠাৎ খুশিতে লাফিয়ে উঠলো, কিন্তু মুখে কিছু বললাম না।

দিন-ক্ষণ দেখে সত্যি-সত্যিই একদিন বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে বিরাট দল-বল। আমি আমার সেই খোপটির মধ্যেই আছি। এর মধ্যে সেটিকে নতুন করে সারানো ও রঙ করানো হয়েছে। জালের দোলনায় শুয়ে চারদিক দেখতে দেখতে চলেছি। খুশি মত ঘুলঘুলি খুলে হাওয়া খাচ্ছি আবার বন্ধ করছি। যেখানে যেতে হবে, তার কাছাকাছি এক জায়গায় এসে আমরা থামলাম। এখানেও রাজার একটি বাড়ী আছে। জায়গাটি ভারী সুন্দর। আঠারো মাইল দূরেই সমুদ্র। ওদের হিসেবে অবশ্য দোর-গোড়ায়ই। ঠিক হলো এখানে কয়েকদিন থেকে তারপর আবার রওনা হবো। আমি সর্দিতে ভুগছিলাম। মেয়েটিও হঠাৎ অসুখে পড়লো। কাজেই আমার ভার একটি বিশ্বাসী চাকরের উপর ছেড়ে দিতে হলো।

মোটে আঠারো মাইল দূরে সমুদ্র! কতদিন সমুদ্র দেখিনি! কতক্ষণে তার পারে যাবো, সেজন্য মন ছটফট করতে লাগলো। শরীর তো খারাপই ছিল, তার উপর মুখের ভাবখানা এমন করে রইলাম যেন সাগরের হাওয়া না পেলে আমার আর ভালো হবার কোনো আশাই নেই। কথায় কথায় মেয়েটিকে তা বলেও ফেললাম। বেচারী বিছানায় শুয়ে। শুনেই ওর মুখখানা যেন কালো হয়ে গেল। নিজে সঙ্গে থাকতে পারবে না। চাকরের হাতে পাঠানো। যতই বিশ্বাসী হোক, বয়সে ছেলে মানুষ। মন যেন কিছুতেই

সায় দেয় না। আমার মুখের দিকে চেয়ে না বলতেও পারে না। ছোকরা চাকরটাকে ডেকে তোতা পড়ানোর মত অনেক কিছু শেখালো, পড়ালো। পই-পই করে সব বুঝিয়ে দিলো। তবু মন যেন মানতে চায় না। যাবার সময় ঝরঝর করে কাঁদতে লাগলো। আমারও চোখ শুকনো ছিল না।

কিচ্ছু ভেবো না তুমি, যাবো আর আসবো, বলে মিষ্টি কথায় ওকে ঠাণ্ডা করে আমি বিদায় নিলাম। যতদূর দেখা যায় জানালা দিয়ে ও করুণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো।

আধঘণ্টার মধ্যেই সমুদ্রের ধারে এসে পড়লাম। সামনে মস্ত মস্ত পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে নীল জল ধু ধু করছিল। পছন্দসই একটি জায়গায় চাকরটা বাক্স শুদ্ধ আমাকে নামিয়ে দিয়ে দোর-জানালা সব খুলে দিলো। ভেতরে বসে আমি এক দৃষ্টে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইলাম। কত কথা যে মনে পড়ছিল কি বলবো!

খোলা হাওয়ায় শরীর এলিয়ে আসছিল। এবার একটু ঘুমোবো। লোকটা দোর-জানালাগুলো ভালো করে বন্ধ করে দিলো। আমিও দোলনায় গিয়ে উঠলাম।

কতক্ষণ পরে জানি না, হঠাৎ একটা ভয়ানক ঝাঁকুনিতে ঘুম ভেঙে গেল। মনে হলো কে যেন এক টানে ছোঁ মেরে বাক্সটাকে শূন্যে তুলে নিয়ে খাড়া আকাশের দিকে উঠছে। ভাবলাম স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু না, এই তো আমি স্পষ্ট জেগে রয়েছি। গলা ফাটিয়ে চাকরটাকে ডাকতে লাগলাম। কিন্তু কোথায় সে? তবে কি আমাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে কোথাও চলে গিয়েছিল? কিন্তু কোথায় যেতে পারে? আবার কোথায়? নিশ্চয়ই গুটি গুটি ঐ পাহাড়ের দিকে। সেখানে পাথরের খোপে-খাপে অনেক পাখির বাসা। ডিম চুরির লোভে ওর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না, এ আমি আগেও দেখেছি। ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। সর্বনাশ। এখন উপায়?

কোথায় চলেছি কিছুই জানি না। কেবল বুঝতে পারছি শোঁ শোঁ করে উপরে উঠে যাচ্ছি। উপরে—আরো উপরে। শার্সির বন্ধ কাচের মধ্য দিয়ে দেখছি শুধু মেঘ আর মেঘ—আকাশ আর আকাশ। হঠাৎ মাথার উপর মস্ত কোনো উড়ন্ত পাখির পাখা ঝাপটানির মত শব্দ কানে এলো। এবার বুঝতে পারলাম, নিশ্চয়ই জটায়ুর মত কোনো দৈত্য ঈগলের হাতে পড়েছি। সে আমার বাক্সটাকে এক টুকরো মাংসের মত মুখে নিয়ে হু হু শব্দে আকাশ ভেঙে ছুটছে।

চোখ বুঁজে শেষবারের মত আমি ঈশ্বরকে স্মরণ করলাম। আর কতক্ষণ? রাক্ষুসে পাখিটা এক্ষুণি হয়ত ঠোঁট থেকে বাক্সটা ফেলে চুরমার করে দেবে, তারপর তার ভেতর থেকে আমার দলাপাকানো মাংসের তালটা ঠুকরে ঠুকরে খেয়ে শেষ করে ফেলবে। উঃ, ভাবতেও দম বন্ধ হয়ে আসছে।

হঠাৎ মাথার উপর আবার এক অদ্ভুত শব্দ। এবার যেন ধাক্কাধাক্কি, ধস্তাধস্তির আওয়াজ। তবে কি আরো কয়েকটা রাক্ষুসে পাখি ঐ ঈগলটার গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই শুরু করে দিয়েছে? এবার আর দেখতে হবে না গালিভার! মৃত্যু একেবারে তোমার মাথার উপর পা দিয়েছে। আর এক মুহূর্তও দেরী নেই। হ্যাঁ, সত্যি তাই। বাক্সটা ভয়ানক বেগে গড়িয়ে নীচে পড়ছে। পাখিটা আমাকে মুখ থেকে ফেলে দিয়ে, হয় পালিয়েছে, নয় তো মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করছে। কিন্তু যা-ই করুক, আমার দফা শেষ। আর কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। তারপরই সব শেষ। আমি পাগলের মত চীৎকার করে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লাম।

পড়ছি তো পড়ছিই, কত উঁচুতে উঠেছিলাম কে জানে?

হঠাৎ এক সময় ঝপাং করে একটা শব্দ হলো আর চারদিক থেকে চারটে জলের দেয়াল লাফিয়ে উঠে এক ঘুরঘুট্টি অন্ধকূপের

পাতালে বাক্সসমেত আমাকে তলিয়ে নিয়ে গেল। তারপর আর কিছুই আমার মনে নেই।

জ্ঞান হলে দেখি, বাক্সটি সমুদ্রের উপর পাঁচ ফুট মাথা জাগিয়ে ঢেউয়ের দোলায় ভাসতে ভাসতে চলেছে। বাক্সটির ফাঁক-ফোকর সব বন্ধ ছিল বলেই জলে পড়ে প্রথমটায় ডুবে গেলেও একটু পরেই ভুশ্ করে আবার ভেসে উঠেছিল। ভেতরেও জলটল বিশেষ ঢোকেনি। গায়ে চিমটি কেটে দেখলাম এখনো বেঁচে আছি, কিন্তু এই পাগলা ঢেউ আর ভয়ঙ্কর স্রোত কখন কোন্ পাথুরে-পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে আছড়ে মারে ঠিক কি! যদি না-ও মারে, খিদেয় তেষ্টায় গলা শুকিয়ে মরা ঠেকাবে কে?

কিন্তু তবু মরলাম না। পুরো চার ঘণ্টা এভাবে বাক্স-বন্দী হয়ে ভেসে রইলাম। তারপর হঠাৎ এক সময় মনে হলো, কে বা কারা যেন বাক্সটি ধীরে ধীরে টেনে তুলছে। কে? কে? বলে আবার আমি পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠলাম।

না, না, কেউ নয়। বোধ হয় আমার মনের ভুল। কিন্তু তাও তো নয়। ঐ তো দড়াদড়ির খস্‌খস্, শেকলের ঠুন-ঠান শব্দ! ঐ তো কোনো শক্ত জিনিসের ধার ঘেঁষে বাক্সটার উপরে ওঠার আওয়াজ! তবে কি কোনো নৌকো? না কোনো বড় জাহাজ? ঈশ্বর! ঈশ্বর! তবে কি সত্যি আমি জীবন ফিরে পেলাম? আনন্দে-অবসাদে, হাসি-কান্নায় দিশেহারা হয়ে আবার আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।

যখন চোখ মেললাম, দেখি জাহাজের একটি গরম কেবিনে নরম বিছানার উপর আমি শুয়ে আছি। পাশে বসে কে একজন আমার মুখে অল্প অল্প গরম দুধ ঢেলে দিচ্ছে। ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কোথায়?

লোকটি বললে, ভয় নেই। আপনি নিরাপদেই আছেন। বেশী কথা বলবেন না। একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন।

তখনো মনে হচ্ছিল যেন স্বপ্ন দেখছি।

পরদিন সকালেই স্বপ্ন সত্য হয়ে দেখা দিলো। যিনি আমাকে দুধ খাওয়াচ্ছিলেন তিনি তখন আর ছায়ামূর্তি নন। এক বিলিতি জাহাজের ক্যাপ্টেন। নাম মিঃ টমাস উইলকক্স। বাড়ী শ্রপ্‌সায়ার। একেবারে খোদ ইংলণ্ডে। 'হুর্‌রে' বলে আমি লাফিয়ে উঠলাম। বললাম, আমার বাক্স? আমার জিনিসপত্র? ক্যাপ্টেন বললেন, বাক্সটি জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

—বলেন কি? তার মধ্যে যে আমার অনেক স্মৃতি, অনেক জিনিসপত্তর!

—সেগুলো সব তুলে রাখা হয়েছে। মায় আপনার চেয়ার-টেবিল, খাট, দোলনা, বিছানা-পত্র, কাপড়-চোপড় পর্যন্ত। কিছুই খোয়া যায়নি।

ধন্যবাদ দেবো কি! ক্যাপ্টেনকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলাম। আলগোছে আমার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে তিনি আমায় সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

প্রথমটা আমার কথা জাহাজের কেউ বিশ্বাস করতেই চাইলো না। ভাবলো আমার মাথা খারাপ হয়েছে, নয় তো হাতে-কলমে না মেরে, খুনী আসামীকে যেমন কোন কোন দেশে বাক্সর ভেতর পুরে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হয়, তেমনি করে আমাকেও জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল; আমি ধরা পড়ার ভয়ে তা গোপন করে নতুন একটি গল্প ফেঁদে তাদের ধোঁকা দিতে চাইছি। কিন্তু যখন বাক্স খুলে অনেক আজগুবী জিনিস তাদের দেখাতে লাগলাম, তখন আর তারা বিশ্বাস না করে পারলো না।

সেই সব জিনিসের মধ্যে ছিল এক-দেড় ফুট লম্বা নানা ধরনের সুঁচ ও আলপিন। ছুতোরের তুরপুনের মত বড় কয়েকটি বোলতার হুল, রানীর দেওয়া, তাঁর নিজের আঙুলের একটি সোনার আংটি যা অনায়াসে জাহাজের যে কোনো লোকের মাথা

গলিয়ে গলায় নেমে যায়। কিন্তু সবচেয়ে যা অদ্ভুত সেটি হলো ওখানকার একটি ছোকরা চাকরের দাঁত ব্যথার সময় ডাক্তার সেটি সাড়াশী দিয়ে টেনে ছিঁড়েছিল, আমি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে আমার বাক্সে তুলে রেখেছিলাম। দাঁতটি লম্বায় পুরো এক ফুট বেড়ও প্রায় চার ইঞ্চি। ক্যাপ্টেনকে আমি দাঁতটি উপহার দিলাম। তিনি তো মহাখুশি। বললেন, আপনাকে খুনী আসামী বলে মনে করেছিলাম বলে মাপ চাইছি। আপনার ভাগ্য ভালো, বাক্সটি আমাদের নজরে পড়েছিল, নইলে কি হতো ভাবতেও ভয় হয়। ভেতরে কেউ আছে কিনা, অনেকবার আমরা চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কিন্তু সাড়া না পেয়ে ফিরেই যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মনে হলো দেখাই যাক না!

আমি বললাম, সাড়া দেবার মত কেউ সেখানে ছিল না। কারণ আমি তখন বেহুঁশ হয়ে আছি।

ক্যাপ্টেন বললেন, তা তো দেখতেই পেলাম।

কিন্তু একটি জিনিসে আমার ভারী অস্বস্তি লাগছিল। ঐ দৈত্যের দেশে এতকাল বাস করার ফলে আমার চোখ যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল! কিছুতেই কোনো জিনিসকে তার ঠিক ঠিক চেহারায় যেন দেখতে পেতাম না। সব কিছুই অসম্ভব ছোট বলে ভুল হতো। এই জাহাজ, তার পাল, মাস্তুল, লোকজন সব কিছুই যেন বিশ্রী রকমের নীচু-নীচু। কেবিনের দোর-জানালাগুলোও তাই। ঢোকবার বা বেরোবার সময় কেবলি মনে হতো, এই বুঝি মাথা ঠুকে যাবে।

দীর্ঘ নয় মাস পরে ১৭০৬ সালের তেশরা জুন যখন ভগবানের দয়ায় দেশের মাটিতে পা দিলাম তখনো এই ভাব একেবারে কাটে নি। জেটি, বাড়ীঘর, গাছপালা, পশুপাখি, লোকজন যা কিছু দেখি মনে হয় যেন ফের আমি লিলিপুটে ফিরে গিয়েছি। মনে হয় পায়ের চাপে এই বুঝি কেউ গুঁড়ো হয়ে গেল : গায়ের ধাক্কায় এই

বুঝি কোনো বাড়ীর দেয়াল ধ্বসে পড়লো। কোনো কিছু সামনে পড়লেই হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে যেতো, এই, তফাৎ যাও, তফাৎ যাও। শুধু বলাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও চট্ করে এক পাশে সরিয়ে নিতাম। লোকে ভাবতো, মাথার স্ক্রু বুঝি ঢিলে হয়ে গেছে।

নিজের বাড়ীতে এসে যখন ঢুকলাম তখনো ঐ ভাব। মাথা নীচু করে ঢুকছি দেখে চাকরটা অবাক হয়ে এমন ভাবে আমার মুখের দিকে তাকালো যে নিজেই লজ্জা পেলাম। আওয়াজ পেয়ে বউ আর ছেলেমেয়েরা যখন নাচতে নাচতে ছুটে এলো তখনো ঐ অবস্থা। ওদেরকে মনে হচ্ছিল ছোট ছোট ডেঁয়ো পিঁপড়ের মত আর নিজেকে মস্ত একটি দৈত্যের মত। আনন্দে আমার দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। ওদেরও তাই। কিন্তু এই বিরক্তিকর অবস্থার জন্য অনেকক্ষণ ঠায় বোবার মত দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর এক সময় কুঁজো হয়ে দুহাত বাড়িয়ে তাদের জড়িয়ে ধরলাম। মনে হলো, দুনিয়ার সমস্ত সুখ, সমস্ত শান্তি যেন এক সঙ্গে বুকের মধ্যে চেপে ধরেছি। অঝোরে কাঁদছি আর বলছি, আর কখনো তোমাদের ছেড়ে যাবো না। আর কখনো তোমাদের ছেড়ে যাবো না···

কিন্তু এত আনন্দের মধ্যেও বুকখানা আর এক ব্যথায় টন টন করে উঠছিল। বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল, ব্রব্‌ডিংনাগের সেই ছোট্ট মেয়েটির মিষ্টি মুখখানি। সে কি জানে আমি বেঁচে আছি? স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সে দিনরাত আমার জন্য কাঁদছে আর ভাবছে আমি আর নেই। তার খেলাঘরের বড় আদরের একটি ছোট পুতুলকে রাক্ষুসে একটা দৈত্য-পাখি সেই যে এসে ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে গেল তাঁর পর থেকে আর সে তাকে দেখতে পায়নি। তার খেলাঘর থেকে সেটি চিরদিনের মত হারিয়ে গেছে। আহা বেচারী!